প্রয়াত মানিক সান্যাল। সফল সানু বক্সি। উঠতি ব্যান্ড ঋ

মিড ডে মিলে মাশরুম
একসঙ্গে পুষ্টি ও সংস্থান

ডুয়ার্সের রিসর্টে প্রথম
অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস

এখন ডুয়ার্স

১৬-৩১ অগাস্ট ২০১৭। ১২ টাকা

অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা আমাদের জীবনকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিয়েছে, কিন্তু তার সাথে অনেক অসুখও এনে দিয়েছে।
তার মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য অন্যতম................

কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে ৪ টি টিপস্ ঃ-

১. প্রচুর জল খান, প্রতিদিন অন্তত ৩ লিটার।

২. দৈনন্দিন খাবারে ফাইবারযুক্ত খাবারের মাত্রা বাড়ান।

৩. মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।

৪. রোজ অন্তত ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করুন।

Issued for the public interest by **Pharmakraft**

From the makers of :

PICOME Susp.

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা। শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

এখন ডুয়ার্স প্রকাশিত বই

পর্যটনের বই

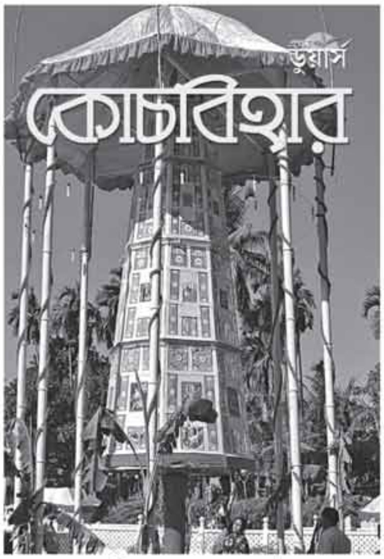

কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

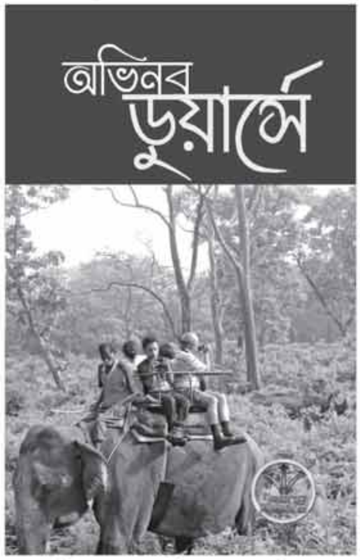

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

চা-শিল্পের বই

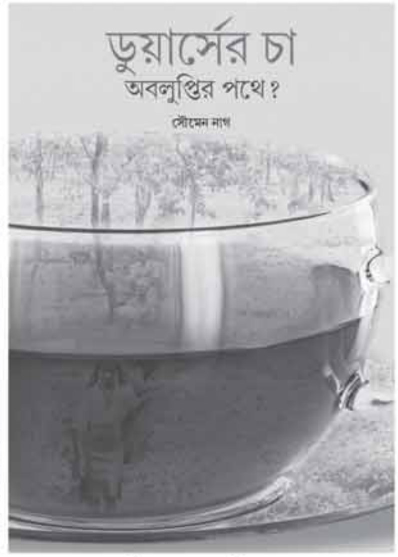

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

সবক'টি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান

আড্ডাঘর।
মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড,
জলপাইগুড়ি

সম্পাদকের ডুয়ার্স

পুজোর ছুটিতে পাহাড় খোলা?

কোনও সন্দেহ নেই, ক্রমাগত চাপ বাড়ছে পাহাড়ে। স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত, খাদ্য-পানীয়র সরবরাহ অনিয়মিত, স্কুল-কলেজ বন্ধ। সবার উপরে বন্ধ তামাম পাহাড়ের ব্যবসাবাণিজ্য। কাজেই বন্ধের হাফ সেঞ্চুরি করে ফেললেও বন্ধ সমর্থনকারীদের উপর মানসিক চাপ যে ক্রমশই বেড়ে চলছে তা তাদের হাবেভাবে স্পষ্ট। তার উপর পুজোর ছুটির আর বেশি দিন নেই। বেশ কয়েক বছর দার্জিলিং পাহাড়ে দুর্দান্ত পর্যটন ব্যবসা হওয়ার পর হঠাৎ এ বছরে শূন্যতা মেনে নেবে না পাহাড়ি বা সমতল কেউই। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, সেই চাপে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করে পুজোর ক'টা দিন বন্ধ শিথিল রাখার ঘোষণা করতেই পারেন পাহাড়ের কাপ্তান গুরুং। সেই হিসেবে পুজোর অন্তত দশ-বারো দিন বাণিজ্যের আশা মনে মনে পুষছেন পর্যটন ব্যাপারীরা— হোটেল মালিক থেকে গাড়ির ড্রাইভার সবাই।

গুরুংদের বাড়াবাড়ি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত দূরের কথা, সামান্যতম মন্তব্যটুকু করেননি। ঝেড়ে কাশছেন না রাজ্য সরকারও। যদিও প্রশাসনিক স্তরে বেশ কিছু রদবদল হয়ে গিয়েছে জনগণের অলক্ষ্যে, কিন্তু এ তো জ্যোতিবাবুর জমানা নয় যে গুলি-ডান্ডা দিয়ে বেয়াদবি 'ঠান্ডা' করা যাবে! তাই রাজ্য সরকার সম্ভবত ধৈর্য সহকারে অপেক্ষায় আছেন, যাতে একটা সময় ধৈর্যহারা পাহাড়ি সাধারণ মানুষের চাপেই গুরুংরা পিছু হটে বা ভুল কোনও চাল দিয়ে বসে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এই পর্যায়ে পৌঁছে আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি হওয়া মানেই যে পুরনো ফর্মুলায় আগের জায়গায় ফিরে যাওয়া এবং তার ঝুঁকি যে এই মুহূর্তে দলের কেউ নিতে রাজি হবে না তা অবশ্য আজকাল গুরুংরা ভালই বোঝেন। সেই সঙ্গে আন্দোলনে তিনি আড়াল থেকে পাচ্ছেন যে জঙ্গি সহযোগিতা, এখন রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় রাজি হলে তা-ও হারাবার আশঙ্কা থাকে। অতএব একমাত্র পাহাড়ের জনরোষই পারে তাঁকে কাবু করতে। রাজ্য প্রশাসনিক কর্তাদের ইচ্ছাকৃত নীরবতা বোধহয় তারই ইঙ্গিত দেয়।

গুরুং তাঁর নিজের ভুলেই নিজে ডুবুন, সম্ভবত এই নীতিতে বিশ্বাসী কেন্দ্রীয় সরকারও। হয়ত সে কারণেই দিল্লি থেকেও কোনও পদক্ষেপ নেই। আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের নিজস্ব ব্যাপার— এই অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়, আপাতদৃষ্টিতে অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে। অন্য দিকে, কালিম্পঙের প্রাক্তন মোর্চা নেতা হরকাবাহাদুর ছেত্রী এর মধ্যেই কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় দলবল নিয়ে দিল্লি গিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন, গোর্খাল্যান্ডই তাঁদের আসল ও মূল দাবি, আর সেই দাবির মান্যতা দিতে পারেন একমাত্র কেন্দ্রই। অতএব দিল্লিতে তাঁদের আন্দোলন আরও জোরদার হবে সন্দেহ নেই। বলাই বাহুল্য, সরাসরি রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে সংঘাতে না গিয়ে গোর্খাল্যান্ডের ইস্যুতে গুরুংকে টপকে এগিয়ে থাকতে চাইছেন ছেত্রী সাহেব। আসন্ন পুজোর ছুটি মরশুমে গুরুং বন্ধ তুলতে সাময়িক শর্তে রাজি হয়ে গেলে রাজনীতির বাজারে পিছিয়ে পড়ার যেটুকু সম্ভাবনা রয়েছে, সেই সুযোগে এগিয়ে থাকার লড়াইয়ে গুরুঙের সঙ্গে দূরত্ব অনেকটা বাড়িয়ে নিতে পারবেন, তা বিলক্ষণ বোঝেন পোড়খাওয়া শিক্ষিত নেতা হরকাবাহাদুর।

পুজোর ছুটিতে পাহাড়ের রাস্তা খুলে না দিলে অস্বাভাবিক চাপের মুখে পড়বে মোর্চা, তাতে পাহাড়ে তাদের সাংগঠনিক ইমেজের ক্ষতির আশংকা। আবার চাপের মুখে একবার রাস্তা খুলে দিলে আন্দোলনের রাশ মুঠো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। সব মিলিয়ে গুরুঙের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যে খুব একটা সুখকর হবে না তা যে কোনও হিসেবেই পরিষ্কার। অবশ্য রাজনীতির লোক তিনি কখনওই ছিলেন না, পাহাড়িদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তাও সবসময়ই ছিল সাময়িক ও চাপিয়ে দেওয়া। বরং সমতলের রাজনীতিবিদদের একের পর এক ভুল সম্মিলিতভাবে গুরুংকে আজ 'ইন্টারন্যাশনাল ফিগার' বানিয়ে দিয়েছে। এখন এটির সংশোধনের পথ খুঁজে বার করা বা গুরুংকে নিষ্ক্রিয় করা যে বেশ কঠিন এবং সময়সাধ্য কাজ তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং, আপাতত আমরা বোধহয় কেবল তাঁর পতনের কামনাই করতে পারি।

চতুর্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৬-৩১ অগস্ট ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫
উত্তরপক্ষ ৮
মানিকদা বলতেন রং দেখে মানুষ বিচার কোরো না
চায়ের ডুয়ার্স, ডুয়ার্সের চা ১৪
রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে চা-বাগানের ন্যূনতম মজুরি আইন অথই জলে
এখন ডুয়ার্স স্পেশাল
মণীষীদের স্মৃতিধন্য শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন ২১
পর্যটনের ডুয়ার্স ২২
ডুয়ার্সের রিসর্টে এই প্রথম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস
ডুয়ার্স বিচিত্রা
মাইক্রো আর্ট ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে
শিলিগুড়ির রমেশ ৩৫
আশি বছর ধরে নেতাজীর অটোগ্রাফ
আগলাচ্ছেন মহাশ্বেতা ৩৬
মিড ডে মিলে মাশরুম! ৩৮
ডুয়ার্সের ব্যান্ড ঋ ৪১
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ১০
তরাই উৎরাই ২৪
লাল চন্দন নীল ছবি ২৯
ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩২
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৩
নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬
ডুয়ার্সের ডায়েরি ১৯
খেলাধুলায় ডুয়ার্স ৩৭
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪০
শ্রীমতী ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের ডিশ ২৬
ঈশ্বরের আপন দেশ কেরালায় ২৬
সাজসজ্জার দেশজ কারুশিল্প ও
'শ্রীমতী ডুয়ার্স স্বনির্ভরা' ২৭
রাজ্য সিভিল সার্ভিসে সফল সর্বকণিষ্ঠা
সানু বক্সি লড়াইয়ের অপর নাম ২৮

প্রচ্ছদ ছবি: বিদীপ রায়, জলপাইগুড়ি ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

হজমের সমস্যা

তা খাঁচার পাখিরা খাঁচাটিতে মন্দ ছিল না। গেরস্তের দেওয়া খাবার খেয়ে সুখেই কাটছিল দিন তার। সক্কাল সক্কাল ঘুম থেকে উঠে গেরস্ত তাকে ছোলা খাওয়াত। কিন্তু সে দিন কী হল জানেন তো?— এক্কেবারে কাফকা সাহেবের মেটাফরফোসিস যাকে বলে! গেরস্ত মর্নিং-এ উঠে খাঁচার সামনে এসে দেখে, পাখিরা হয়ে গিয়েছে সাপ। খাঁচার ফুটো দিয়ে অর্ধেক বডি বার করে সে সাপ 'সজল চক্ষে করুন রক্ষে' মার্কা চেহারা নিয়ে ঝুলে রয়েছে। গেরস্ত অবশ্যি তক্ষুনি বুঝে নিয়েছিলেন কেসটা। ব্যাটা সরীসৃপ রাতে পিঞ্জরে প্রবেশ করে চারখানা পাখি হজম করে আর পালাতে পারেনি। আসলে পাখি খেয়ে ফুলেছে পেট। খাঁচার ফুটোয় সে পেট আটকে গিয়েছে। ফলে সর্প দর্প হারিয়ে ভেবলু! তা খাঁচার তার কেটে সে সর্পকে জঙ্গলে ফেরত দেওয়া হয়েছে শেষ পর্যন্ত। জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়ায় ঘটেছে।

খুচরো ডুয়ার্স

খুচরো এমন জিনিস, যা কম থাকলেও যা, বেশি থাকলেও তা-ই। এদ্দিন খুচরো পাওয়া যেত না বলে ব্যবসা মার খাওয়া নিয়ে হাহাকার শোনা যেত। এখন উলটো। বাজারে খুচরোই খুচরো। পসারির অভিযোগ, পাবলিক নাকি দেড়-দু'শো টাকার বিলও খুচরো পয়সায় দিচ্ছে। আর পাবলিক বলছে, দেশের টাকা নিচ্ছে, পয়সা নেবে না কেন? আক্ষরিক খুচরো ব্যবসায়ী, মানে যাদের দাম খুচরোতেই হয়, যেমন খবরের কাগজ— পড়েছেন আরও ঝামেলায়। আশি টাকার গুয়া-পান বেচে পুরোটাই খুচরো পাওয়া ব্যবসায়ী দিনের শেষে ক্রেতা হতে গিয়ে পড়ছেন ঘোর আতান্তরে। তা ব্যবসায়ীরা অবশ্যি এটাও বলছেন যে, ব্যাঙ্ক খুচরো নিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু দু'-চারটে ব্যাঙ্ক ছাড়া কেউ খুচরো ঝামেলায় আগ্রহী নয়। বলছে, কে গুনবে? তবে, যে ব্যাঙ্ক নিচ্ছে, সে গুনছে কীভাবে কাকা?

বাহুবলী শ্রমিকদল

বানারহাটের সেই চা-বাগানের শ্রমিকরা সকালে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে বাগানের দু'টি পাতা, একটা কুঁড়ি তুলতে গিয়ে ঘাবড়ে-টাবড়ে একসা! বাগানে পাতা-কুঁড়ি তোলার জন্য একদল নতুন শ্রমিক দণ্ডায়মান। তবে কি বাগান মালিক রাতের আঁধারে চুপিচুপি পুরো পালটে দিল গো? আরে না না! এ বাগান অমন বাগান নয়। মুশকিল যে, নতুন শ্রমিকরা আবার চা-বাগানের আইন মানে না। মানে, মানতে বাধ্যই নয় মোটে। পাতা-টাতা তুলতে আসেনি মোটেই। সঙ্গে ছানা ছিল। করিডর দিয়ে যাওয়ার পথে চমৎকার বাগান দেখে ক'টা দিন কাটাতে এসেছে। এরপর পটকাবাজি ফাটিয়ে, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে ওনাদের বাগান ছাড়া করতে প্রকৃত শ্রমিকদের মাথা আউলা হয়ে যাওয়ার জোগাড়। বাগানের পাশ দিয়ে তেনারা এদ্দিন যাওয়া-আসা করতেন। হঠাৎ বাগানপ্রেমী হয়ে ওঠায় ভারী চিন্তা হচ্ছে।

ভেক বিবাহ

শ্রাবণে রাবণের মতো গরম। বৃষ্টি তো কোন ছার, মেঘ কেমন দেখতে, সেটাও ভুলে যাওয়ার জোগাড়। রাজামশাইকে খুশি করা ছাড়া আর কোনও উপায় নাইকো! তা বৃষ্টির ক্যাবিনেট সামলানোর দায় দেবরাজের হলেও তিনি তো আসবেন না। তাই 'কাউকে' 'তিনি' সাজিয়ে পুজো দেওয়া ছাড়া গতি কী? অতএব খোঁজ সোনা ব্যাং। ইন্দ্রের নামে তাকে বিয়ে দিলেই রাজামশাই খুশি হবেন। বিয়ে হবে। খরচা চাই। তোলো চাঁদা। ঝপাঝপ উঠেও গেল।

ভাত-ডাল-মাংস-মিষ্টি খেলেন শ'চারেক। মেলাও বসে গেল। বিয়ের পর নতুন বউ পেয়ে দেবরাজ খুশি হয়ে চেরাপুঞ্জি থেকে কয়েক একর মেঘ ময়নাগুড়িতে পাঠাবে কি না, সেটা অবশ্য বিশ্বাসের ব্যাপার। তবে এটা একটা লোকাচার।

জটিল

গ্রাম্য বধূ পঞ্চায়েতের কাছে রিকোয়েস্ট করেছিল যে, তার ছোট পুকুরটা যেন একশো দিনের কাজের তালিকায় ফেলে একটু সাফ করে দেওয়া হয়। তা এমন রিকোয়েস্ট হয়েই থাকে। কয়েকটা লোক এসে সাফাই করেও গেল। আপ্লুত বধূ একদিন হাসিমুখে পুকুরঘাটে জল আনতে গিয়ে চমকে চমচম হয়ে গেলেন। পুকুরপাড়ে বোর্ড লাগিয়ে লেখা যে, সে পুকুর সাফাই করতে দু'লক্ষাধিক খরচ হয়েছে এবং বারোশো লোক শ্রম দিয়েছে। চমকিত বধূ এবার ছুটলেন পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের পাবলিকরা বলল, আরে না! শুধু তোমার পুকুর নয়। পাশের বাড়ির অমুকবাবুর জমিটা সাফ করালাম তো! দুটো মিলে এই খচ্চা। লিখতে ভুল হয়েছে। শুনে রেগে আটটা হয়ে অমুকবাবু বলেছেন, মামদোবাজি? তাই যদি হয় তো আমার বাড়ির সামনে বোর্ড লাগাওনি কেন? অবশ্য, আগাছা সাফাইয়ের আড়াইলাখি খচ্চা নিয়ে এখনও নাকি কেউ অভিযোগ জানায়নি। খুব জটিল, তা-ই না মামা?

পটিরত্ন

মাঠেঘাটে পটি করার বিরুদ্ধে জোর লড়াই-প্রচার চলছে। তা পট্যাগার বানাতে

খচ্চা আছে। গরিব পাবলিক পেটের চাপ হালকা করতে গিয়ে পকেটে চাপ না টের পায়, তাই 'অফসর' লোক তদন্ত চালাচ্ছিলেন ফ্রি পট্যাগার গঠন নিয়ে। তা তদন্ত করে কী পেলেন তাঁরা? তাঁরা দেখলেন, পকেটে চাপ ব্যাপারটা অবশ্যই আছে। কিন্তু যাদের কাছে সে চাপ একটা বালুকণার চাইতেও তুচ্ছ, তাঁরাও জপছেন, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, লোটা হাতে মাঠেঘাটে পটাইতে চলি।' স্লেটের মতো মোবাইল কানে মাঠে পটি করতে যাচ্ছে ক-ত্ত লোক! হাতে এক গন্ডা সোনার আংটি আর কুকুর বাঁধা চেনের মতো সোনার শেকল পরে মাঠে বসছেন কত্ত দাদা-কর্তা! এইসব পটিরত্নকে নিয়ে বিশেষ চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন 'অফসর' লোক। শেষে ঠিক করেছেন যে, প্রথমে বোঝানো হবে। না বুঝলে পটি করার ছবি ভাইরাল করার ব্যবস্থা হবে।

অবাক জলপান

ঝাঁ-চকচকে বহুতল। নামীদামিদের জায়গা। পেল্লায় বাহারি গেট। তা পেরলেই একদিকে বিরাট কংক্রিটের গামলা। ভরতি জল। তা কেয়ারটেকারবাবু সে দিন ডিউটির ফাঁকে হিসু পাওয়ায় গিয়েছিলেন হিসুমহলে। তখন রাত দুটো। হালকা হয়ে ফিরে আসার পথে শুনলেন 'চক চক চক'! কে জানি জল খায় সেই টাব থেকে! গোরু ঢুকল নাকি? সব্বনাশ! পটি করে রাস্তার বারোটা বাজালে গোমাতা ভেবে মালিকরা তাকে কিছু না

বলতে পারে, কিন্তু দোপেয়ের চাকরি এক্কেবারে নট হয়ে যাবে! তাই তিন লাফে কিছুটা এগিয়ে এসে পিপাসার্তকে দেখলেন। তারপর হিম হয়ে গেলেন! গোরু নয়, গোরুখেকো! এক্কেবারে সেন্ট পার্সেন্ট কমপ্লিট বাঘ একখানা! জল খেয়ে প্রাচীর টপকে ভ্যানিশ হয়েছে সে। শিলিগুড়ি শহরে? ঠিক তা-ই। বাঘ এসে জল খেয়ে গিয়েছে সে শহরে রাত দুটোয়। সাবধান রে ভাই। বেশি রাত করিসনে আর!

টুক্রাণু

জল্পেশ মেলায় জল ঢালা, মিষ্টি খাওয়া এবং পকেটমারি এবারেও পুরোদমে। মশাদের বিরুদ্ধে পরমাণু যুদ্ধ শুরু কোচবিহার পুরসভার। পাহাড়াশান্তির ফলে উড়ছে না পর্যটকরা বাগডোগরায়। বাংলা ভাগের বিরুদ্ধ সই সংগ্রহকারীদের ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে অজ্ঞাত কারণে তুমুল গালি দিলেন এক শিলিগুড়িবাসী। চা-পাতা ভেবে কীটনাশক দিয়ে তৈরি চা খেয়ে ফালাকাটার পরিবার হাসপাতালে সুস্থ হচ্ছেন। সেনা ছাউনি থেকে চিতা গ্রেপ্তার করে ছাড়া হল বেঙ্গল সাফারিতে। চালসার এটিএম থেকে বার হচ্ছে আহত দু'হাজারি নোট। রোজ বদলানো নিশ্চিত করতে সাত দিন সাত রঙের চাদর পাতার তোড়জোড় আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে। কুড়িয়ে পাওয়া সোনার আংটি নিয়ে দু'জনের ঘুসোঘুসি চরের বাড়িতে, যা আসলে পিতল ছিল।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬৮৩৯৮৮

চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯

মাথাভাঙা
নেপাল সাহা ৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭

মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১

রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২

বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

মানিকদা বলতেন রং দেখে মানুষ বিচার কোরো না

পাঁচের দশকের শেষ প্রান্তে চা-বাগান থেকে চলে এসেছি জলপাইগুড়ি শহরে— লেখাপড়ার জন্য। প্রথম কয়েক মাস মহুরিপাড়ার ভাড়া বাড়ি, তারপর মহন্তপাড়ার মোড়ে শচীন পালমশাইয়ের বাড়িতে। একদিন মা-র সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে গিয়েছিলাম কামারপাড়ায় ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালমশাইয়ের বাড়ি। তখনও ওই বাড়ি লোকজনে গমগম। সান্যালদের সঙ্গে আমাদের নাকি লতায়পাতায় আত্মীয়তা ছিল। চারুচন্দ্র সান্যাল ছিলেন সর্বগুণসম্পন্ন চিকিৎসক, দার্শনিক, লেখক, সমাজতত্ত্ববিদ এবং উদারপন্থী রাজনীতিবিদ। অমন পিতার পুত্র মানিক সান্যাল ছাত্রজীবনে দারুণ ডাকসাইটে ছিলেন। তৎকালীন মস্তানি কালচারে হকি স্টিক নিয়ে মারামারি সাধারণ ব্যাপার ছিল। মানিকদা ছাত্রজীবনে প্রচুর মারপিট করেছেন এবং নিজেও মার খেয়েছেন। ওঁর ছোট বোন এণাক্ষী বাগচির সঙ্গে আজ (০৬-০৮-২০১৭) মানিকদার বাড়িতে দেখা হয়েছিল। অনেক কথা বলেছি— পাশে মানিকদার পুত্র জয়দীপ ছিল।

মানিকদার জন্ম ৬ ডিসেম্বর ১৯৩৫

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

সালে। কৈশোরের চূড়ান্ত অস্থিরতা ঘন ঘন স্কুল পরিবর্তনে আভাস পাওয়া যায়। প্রথমে পড়তেন জেলা স্কুলে, তারপর কিছুটা সময় ফণীন্দ্র দেব ইনস্টিটিউশনে এবং শেষ পর্যন্ত সোনাউল্লা হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে আইএসসি পড়লেন এবং পাশ করলেন। তখনও তিনি দুর্নিবার, অশান্ত। ফিরে এলেন জলপাইগুড়ি, বিএ পড়লেন জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে। তখন তিনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। বর্তমান আলিপুরদুয়ারের তরুণ বিধায়ক এবং এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর পিতা প্রয়াত সমীরণ চক্রবর্তী ছিলেন কলেজের সহপাঠী এবং বন্ধু।

বামপন্থী রাজনীতিতে জলপাইগুড়ির দু'জন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব নরেশ চক্রবর্তী এবং সুবোধ সেনের হাত ধরে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন। ছাত্রজীবনে যে মানুষটার পড়াশোনায় ছিল প্রচণ্ড অনীহা, তিনি ডুবে গেলেন রাজনীতি সংক্রান্ত বইপত্রের মাঝে। তখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি চা শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার নানা দাবিতে আন্দোলনরত। পরিমল মিত্র লাল পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা। পরিমলবাবু মানিকদাকে ডুয়ার্সে চা শ্রমিকদের পাশে ঠাঁই করে দিলেন। বানারহাট, মালবাজার, নাগরাকাটার টি বেল্টে সংগঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। শ্রমিকমহল্লায় দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, ওদের গৃহে বাস করেছেন, ভাগ করে আহার সেরেছেন। মা মনোরমা সান্যাল সর্বদাই পুত্রের চিন্তায় অধীর থাকতেন। মানিকদা সেই সময়টা পড়াশোনার দিগন্ত অনেকটা বিস্তৃত করেছেন।

এণাক্ষী বলছিলেন, কলেজে পড়ার সময় একবার মানিকদাকে হকি স্টিক, লোহার রড দিয়ে ভীষণ মারা হয়েছিল। গ্রন্থভারতী মোড়ের কাছে বেহুঁশ পড়ে ছিলেন। অপরাধী ধরা পড়েছিল— সে ছিল বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র। ওরা এসে মনোরমাদেবীর হাতে-পায়ে ধরেছিল। নিজের তিন পুত্র, দুই কন্যা, তিনি মায়ের ব্যথা বুঝতেন। অপরাধীকে মাফ করে দিতে দ্বিধা করেননি।

মানিকদার স্ত্রী সদাহাস্যময়ী সাধারণ মহিলা ছিলেন। প্রাইমারি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। টাকাপয়সার দরকার পড়লেই মানিকদা বউদির অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে আসতেন। উনি ব্যাঙ্কে আমার অফিসে এসে বসতেন। আড্ডা জমে যেত। চা খেতে খেতে তাঁর কাছে পুরনো দিনের অনেক কথা শুনেছি। উনি তাঁর ভালবাসার মানুষদের কারণে-অকারণে বকাবকি করতেন। একবার আমাদের স্কুলের বন্ধু এবং প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের নেতা বীরেশ শিকদার মানিকদা আমার অফিসে আড্ডা মারছেন শুনতে পেয়ে দেখা করতে চলে এল। মানিকদা খেপে লাল। ধান্দাবাজ-স্বার্থপর ইত্যাদি কিছু বাক্যবাণ নিক্ষেপ করলেন। বীরেশ চুপচাপ দেখে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখো, যেন ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না।' আশ্চর্য, একটু পরেই স্বাভাবিক এবং বীরেশের কিছু

যুবক মানিকদা জ্যোতি বসুর সঙ্গে

একটা অনুরোধে সম্মতি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরামর্শও দিলেন।

জলপাইগুড়িতে ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের বাৎসরিক সাধারণ সভায় তাঁকে সাংসদ হিসেবে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমরা। জলপাইগুড়ি থাকলে উনি হাজির থাকতেন। এখন নেতারা আগে খোঁজ নেন অনুষ্ঠানে জমায়েত কেমন— সভা প্রাঙ্গণ পূর্ণ হলে তবে প্রবেশ করেন। সব দলের এখন এটাই চালু দস্তুর। প্রতিবারই আমাদের প্রকাশ্য অধিবেশনে কম সদস্য হাজির থাকত। মানিকদা সময় নিয়ে বসে থাকতেন। এক-দু'কাপ চা খেতেন। সভায় বক্তৃতা দিয়ে বিদায় নিতেন।

উনি লোকসভা ভোটে দু'বার জয়লাভ করেন ১৯৮৪ সাল এবং ১৯৮৯ সালে। দু'বারের সাংসদ, কিন্তু পরিবার-পরিজনদের দিল্লি ভ্রমণ তাঁর মোটেই পছন্দের ছিল না। জলপাইগুড়িতে একটা প্রচলিত কথা ছিল— 'মানিক সান্যাল পার্লামেন্টে মানুষের দাবি নিয়ে কথা বিশেষ বলতেন না।' একবার মানিকদা বললেন, 'আমাদের পার্টিতে যে যখন ইচ্ছে পার্লামেন্টে বলবে— এটা একদম চলত না। কে কোন বিষয়ে কী বলবে তা পার্টি ঠিক করে দেয়।'

ওঁদের পরিবারের একজন সদস্য বলছিলেন, ১৯৭৫-'৭৬ সালে কিছু কংগ্রেস নামধারী গুন্ডা প্রকৃতির লোক মানিকদাকে ঘিরে ধরে। দলের লড়াকু শ্রমিকরা তির-ধনুক নিয়ে ছুটে আসে। সেই সংঘর্ষে একজন মারা যান। পুলিশ কেস হয়। বহুদিন মানিকদাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়।

২০০১ সালে ধূপগুড়ি ব্লকের ডাউকিমারির কাছে মানিকদা জোর গলায় বিচ্ছিন্নতা বিরোধী বক্তব্য রাখলেন। তখন কেএলও-দের জঙ্গিপনায় ডুয়ার্সের শান্তি হারিয়ে গিয়েছে। মানিকদার বক্তব্য ওদের স্বার্থ বিরোধী, ওরা খেপে উঠেছিল। গাড়ি করে ফিরছিলেন, সঙ্গে ছিল টৌটন সেনগুপ্ত। পথের মাঝে গাড়ি আক্রমণ করা হয়েছিল। হয়ত প্রাণনাশ হতে পারত। নিজের সাহসিকতায় সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন। ওই দিন সন্ধ্যায় ধূপগুড়িতে স্বল্প নোটিশে হাজার লোকের মিছিল প্রতিবাদ জানাতে হাজির ছিল।

আসলে আমি ৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে বেলা ১১টায় মানিকদার বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম। দেখি একদম আড়ম্বরহীন সাদা কাপড়ের প্যান্ডেল। আমি জানতাম না সে দিন মানিকদার পারলৌকিক কাজ। বারান্দায় একটা চেয়ারে মানিকদার ছবি। ফুলে ফুলে ঢাকা। কেউ একজন একটা ছোট গীতা রেখে দিয়েছিল। মানিকদার পুত্র সোনা (জয়দীপ) বলে উঠল, 'গীতা সরা, ওখানে দাস ক্যাপিটাল রাখলে মানানসই হত।' বাড়িতে জনসমাগম খুব কম। কিছু আত্মীয় আর বেশ কিছু নতুন প্রজন্মের তরুণ। ওরা যদি মানিকদাকে সম্মান জানাতে এসে থাকে, তবে বলতেই হবে— পৃথিবী আশাহীন হয়ে যায়নি। অনেকের মাঝে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির ছিলেন তৃণমূলের তরুণ নেতা চন্দন ভৌমিক। এই সৌজন্য ভাল লাগল। দেবপ্রসাদ রায় (মিঠু) রাজ্যের তথা জাতীয় স্তরের কংগ্রেস নেতা— ওঁর সঙ্গে মানিকদার সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ছিল। মেরিনা নার্সিং হোমে মানিকদাকে দেখে এসে মিঠু আমায় বলেছিল, 'মানুষটা আর বেশি দিন নাই রে।' আমি নিশ্চিত, মিঠু জেলায় থাকলে অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাতে হাজির থাকত।

মানিকদার শয়নকক্ষের একাংশ

বারান্দায় একটা চেয়ারে মানিকদার ছবি। ফুলে ফুলে ঢাকা। কেউ একজন একটা ছোট গীতা রেখে দিয়েছিল। মানিকদার পুত্র সোনা (জয়দীপ) বলে উঠল, 'গীতা সরা, ওখানে, দাস ক্যাপিটাল রাখলে মানানসই হত'।

২৭ জুলাই ২০১৭ রাত্রি বিদায় নেবে, আসছিল ২৮ জুলাই ২০১৭, সেই সন্ধিক্ষণে কলকাতায় আরএন টেগোর হাসপাতালে মানিকদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পাশে পুত্র সোনা উপস্থিত ছিল। সোনা ওই হাসপাতালে ডাক্তারসহ সমগ্র চিকিৎসাব্যবস্থার গভীর প্রশংসা করেছিল।

২৮ জুলাই সন্ধ্যায় প্রদোষ, শুভ্র, মৃগাঙ্কর সঙ্গে আড্ডাঘর-এর দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্তিম যাত্রার মিছিল দেখছিলাম। মূলত সাধারণ মানুষ আর চা-বাগানের কিছু শ্রমিক যোগ দিয়েছিল সেই মিছিলে। দাঁড়িয়ে আটের দশকের মানিকদার কথা ভাবছিলাম কী প্রতাপ, কী প্রতিপত্তি!

মানিকদা তাঁর সতীর্থদের তিনটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের কথা বলতেন— (১) রং দেখে মানুষ বিচার কোরো না, (২) শিরদাঁড়া সোজা রেখে পার্টি করবে, (৩) মানুষের পাশে থাকতে হবে।

হাফহাতা ফতুয়া, পাজামা এবং চপ্পল তাঁর প্রিয় পোশাক। শরীর ভাল থাকলে থলে হাতে দিনবাজারে বাজার করতে যেতেন। মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন। মাঝে মাঝে ফতুয়া ও লুঙ্গি পরেই বাজারে আসতেন। ওই লম্বা, বয়সের ভারে একটু ঝুঁকে চলা মানুষটিকে আর জলপাইগুড়ির রাস্তায় দেখা যাবে না।

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লেখার প্রতি অনুরাগ ছিল। জীবনে অবসর বড়ই কম ছিল। তার মধ্যেই সময় বার করে লেখালেখি করেছেন। এগুলোর সংরক্ষণ হওয়া দরকার। তরুণ লেখকদের সর্বদা উৎসাহ দিয়েছেন।

দু'বছর আগে হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছিল মানিকদার স্ত্রীর। তাঁকে বাঁচানো যায়নি। মানিকদার প্রায় পঞ্চাশ বছরের সঙ্গী তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। বড় একা হয়ে গেলেন। এতদিন যাদের সঙ্গে পার্টি করেছেন, ধীরে ধীরে তারাও আর খুব বেশি যোগাযোগ রাখত না। একাকিত্বের ভয়ানক কষ্ট তিনি শেষ বয়সে তিলে তিলে ভোগ করেছেন। মানিকদার বাড়ি থেকে চলে আসার আগে একবার তাঁর টিনের চালের বেডরুমে ঢুকলাম। প্রশস্ত একটা সাধারণ খাট। দু'-একটা সাধারণ আসবাবপত্র। দেওয়ালে পিতা-মাতার ছবি। আর আছে বউদির হাতে টাঙানো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটা ছবি। কবিগুরুকে স্মরণ করে মানিকদার বাড়ি থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেরিয়ে এলাম—

'নিশা অবসানে কে দিল গোপনে আনি
তোমার বিরহ-বেদনা-মানিকখানি।।
সে ব্যথার দান রাখিব পরান মাঝে—
হারায় না যেন জটিল দিনের কাজে,
বুকে যেন দোলে সকল ভাবনা হানি।'

দেবপ্রসাদ রায়

কিউবা থেকে ফিরে আবার দেশের বৃত্তে। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে যাবেন রাজ্যসভায়। প্রণব মুখার্জি কেন বললেন ভোটার লিস্ট দেখার কথা? লেখক যে রাজ্যে রাজনীতি করবে না— সে প্রতিশ্রুতি বাংলার কাকে দিয়েছিলেন রাজীব গান্ধি? এদিকে লেখকের ভাষণ শুনে চা খেতে ডাকলেন বিড়লা। সেখানেও রহস্য। বিরাট এক সম্মেলনের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন লেখক। সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল— কিন্তু থমকে গেল চার দিন আগে। আসলে সম্মেলনের দিনক্ষণ ঠিক ছিল ৩ নভেম্বর, ১৯৮৪। এখন থেকে দু'টি করে পর্বে আরও উত্তেজনা।

।।৩৯।।

কিউবা সফর করে এসে নিয়মমাফিক প্রণবদার বাড়িতে সন্ধ্যাকালীন হাজিরা আবার শুরু হল। প্রণবদার সবচেয়ে বড় গুণ, আমার মনে হয়েছে, সকলের সঙ্গে দেখা করা। যত রাতই হোক, উনি শেষ ভিজিটরকে না দেখা করে কখনও অফিস ছাড়তেন না।

আমার টার্ন সবসময়েই শেষের দিকে হত। কারণ ওঁর যারা বাড়ির অফিস সামলাতেন (মুখার্জিদা, ঝাম্প, বীরেন্দ্ররজী, বীজয়েন্দর) তাঁদের বক্তব্য ছিল, আপনি গেলে গল্প জুড়ে দেন, ফলে অন্যদের অনেকক্ষণ বসতে হয়। আমি এর সত্যতা অস্বীকার করতে পারিনি। কারণ ওঁদের প্রতিক্রিয়া অমূলক নয়। কিন্তু যেটা বলা যেত না, অন্য সবাই কাজ নিয়ে যেত। ফলে প্রণবদা তাদের বিদায় করে দিতে সময় নিতেন না। আমি যেতাম রাজনৈতিক বিষয়ে ওঁর মতামত নিতে। অথবা, কোনও বিষয় নিয়ে আমাকে কেউ খুব ধরেছে, রাজীবজীকে বলবার জন্য, সেটা বলা ঠিক হবে কি না।

একদিন একটা বিষয়ে মতামত চাইতে গিয়ে একবার খুব বকুনি খেয়েছিলাম। আমাদের ডিভিশনাল কমিশনার ছিলেন মেনন সাহেব। অনেকের হয়তো মনে আছে। উনি পরে রাজ্যের কৃষি সচিব হয়েছিলেন এবং কৃষির বিষয়ে ওঁর পারদর্শিতা সর্বজনবিদিত ছিল।

আমি যখন দিল্লিতে মোটামুটি একটা জায়গা করে নিয়েছি, তখন উনি প্রতিরক্ষা সচিব। অশোকা হোটেলে একটা সরকারী অনুষ্ঠানে দেখা হল। শুনলাম ওঁকে পুশা ইনস্টিটিউটে কৃষিবিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্রের প্রধান করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা সচিব থেকে পুশায় অবতরণ। মেলাতে কষ্ট হচ্ছিল। উনি বললেন, 'রায়, তোমার সাথে আমি একটু আলাদা কথা বলতে চাই। তুমি কি একবার আমার অফিসে আসবে?' আমি ততক্ষণাৎ রাজী হয়ে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললাম। কারণ ওঁর এই অবনমন দেখে আমারও খারাপ লাগছিল। যেদিন অফিসে দেখা হল, উনি প্রায় কেঁদে ফেলেন। 'রায়, তুমি জানো আমি কত সুনামের সাথে কত বড় বড় পদে কাজ করেছি। আজ আমাকে এক রকম নির্বাসিত করে রেখেছে। এগুলো নর্থ ইণ্ডিয়ান লবির কাজ। আমার হয়ে বলার কেউ নেই। তুমি কি একটু রাজীবজীকে বলবে?' বিষয়টা যেহেতু খুবই স্পর্শকাতর— আমি তাই একদিন প্রণবদাকে বললাম, মেনন সাহেবের জন্য রাজীবজীকে বলা ঠিক হবে কি না।

প্রণবদা বললেন, 'উজবুকের মতো কথা বলো না। কোন কারণ না থাকলে একজন দক্ষ অফিসারকে ওরকম তাৎপর্যহীন জায়গায় পাঠিয়ে দেবে? ভালো করে খোঁজ নাও। জানতে পারবে ওর নির্বাসন কেন।' আমার সত্যি কি মিথ্যা জানবার সুযোগ ছিল না। তবে পরে জেনেছিলাম যে, ওঁরই প্রতিরক্ষা দপ্তরের একজন মহিলা সহসচিব ওঁর নামে ইন্দিরাজীর কাছে অভিযোগ জানানোর পরিণতিতে ওঁকে ওই নির্বাসনে যেতে হয়েছিল।

তবুও আমি শিখিনি। তার পরবর্তীতে রাজীবজী যখন প্রধানমন্ত্রী, তখন আমি এমনই একটা মূর্খামি করে ফেলেছিলাম। সে গল্প

পরে শোনাব। যে কথা বলছিলাম। দিল্লিতে আমার কাছে প্রণবদা দলের একজন প্রবীণ মন্ত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন অভিভাবক। এবং সারা দিনের দপ্তরের কাজ ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের আবেদন নিবেদন শুনে যখন প্রায় ধৈর্যহারা হয়ে পড়তেন, তখন আমার টার্ন আসত। আমি গিয়ে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই ওঁর ভেতরের রাজনীতিবিদ প্রণব মুখার্জি বেরিয়ে আসতেন।

এরকমই একটা অবকাশে, তখন উনি ২নং যন্তরমন্তর রোডে থাকতেন, তার উল্টো দিকেই আমার অফিস। ৫, রাইসিনা রোড। আমার তখন আলাদা বাজেটও ছিল। সে সময়ে, মাসে ২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। যাই হোক, একদিন রাতে অফিস ফেরতা যেমন যাই, তেমন গেছি। যখন ডাক এল, প্রণবদা এ কথায় সে কথায় বললেন, তোর ভোটার লিস্টে নাম ঠিক আছে তো? আমি বললাম, কেন? দাদা বললেন, রাজনীতিতে থাকলে এটা সব সময় দেখে রাখতে হয়। কখন কোন কাজ এসে যায় কে বলতে পারে! ভাগ্যিস কথাটা সিরিয়াসলি নিয়েছিলাম। না হলে একবার যে রাজ্যসভায় ছ'বছরের জন্য প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম, তাও অধরা থেকে যেত।

আমি '৮২-তে ক্রান্তি থেকে লড়েছি। তাই ভোটার লিস্টে নাম না থাকার কোনও কারণ নেই। তবুও সাবধানের মার নেই। আমি জলপাইগুড়ি এসে আমাদের এলাকার (আজ ৬নং ওয়ার্ড) ভোটার তালিকা দেখবার জন্য ইলেকশন অফিসে গিয়ে আমাদের পার্টের তালিকা চেক করে দেখলাম, সুপরিকল্পিতভাবে আমার নাম এমনভাবে বিকৃত করা আছে, না আমি কোনও ভোটে দাঁড়াতে পারব, না কোনও ভোটে ভোট দিতে পারব। নামটা হয়ে আছে 'রায় দে প্রসাদ, বয়স ২১।' সংশোধনের প্রশ্ন তোলাতে বলা হল যে, সময় পার হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই। মেজদা (বাবলু) আঁচ করতে পেরেছিল, প্রণবদা যখন বলেছে, তখন নিশ্চয়ই কোনও ব্যাপার আছে। ও ফেডারেশনের নেতা ছিল। কলকাতায় যোগাযোগ করে জানতে পারল যে ইলেকশনে ম্যানুয়ালের ৯ ধারা অনুযায়ী কেউ বছরের যে কোনও সময়েই ভোটার লিস্টে নাম তুলতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার নাম সাত দিন বাইরে নোটিশ বোর্ডে ঝোলানো থাকবে, কোনও আপত্তি জমা না পড়লে ৮ দিনের মাথায় নাম তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা কলকাতায় সম্ভব। জলপাইগুড়িতে নয়। মেজদা কলকাতায় ফেডারেশনের নেতাদের সাথে কথা বলে আমাকে জানাল, তুই তোর সিআইটি-র ফ্ল্যাটের ঠিকানায় কলকাতা কালেক্টরেটে অ্যাপ্লাই করে দে। এখানকার ভরসায় থাকিস না। যথাসময়ে আমার নাম ভোটার তালিকায় স্থান পেল।

প্রণবদাকে গোটা ব্যাপারটা জানালাম। উনি শুধু বললেন, বাংলার ভোটার লিস্টে কারচুপি দিয়েই নির্বাচনের রিগিংটা শাসকদল শুরু করে। তাই সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। সময়টা ১৯৮৪-র ফেব্রুয়ারি মাস। আমার এক বছর তালকাটোরার তাঁবুতে থাকা হয়ে গেছে। একদিন ন্যাশনাল কাউন্সিলের সভায় রাজীবজী তাঁর ভাষণে এক জায়গায় বললেন, 'Hard work never goes unnoticed.' বলে আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি, মনে হল, একটা বার্তা পেলাম।

রাজ্যের তখন একমাত্র রাজ্যসভা আসন নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়ে গেছে। কেউ বলছেন, এ আসনে প্রিয়দা যাবে। কেউ বলছেন, না জাস্টিস পি এন ভগবতীর নাম ফাইনাল হয়ে গেছে— আরও কত নাম বাজারে ঘুরছে! আমি যুব কংগ্রেসের দপ্তরে শুনতে পাচ্ছি, রাজীবজী বেশ কয়েকজন যুব কংগ্রেসের পদাধিকারিককে এবারে রাজ্যসভায় নিয়ে আসবেন। আমি আর আনন্দ শর্মা একই বাড়িতে থাকতাম (৭০, সাউথ এভিনিউ)। রাতে রোজ আলোচনা হত। আমি বলতাম, আমার হবে না, তোর হবে। ও বলত, তোমার হবে, আমার হবে না। কারণ উভয়েরই আশঙ্কা ছিল রাজ্য নেতৃত্ব বাধা দেবে।

অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে হলও তাই। জনান্তিকে শুনলাম, বরকতদা ইন্দিরাজীকে বলেছেন, ওকে রাজ্যসভায় আসন দিলে রাজ্যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে, আমায় অসুবিধায় ফেলবে। ইন্দিরাজীর বরকতদার প্রতি একটা স্নেহসুলভ প্রশ্রয় ছিল। তাই আমার রাজ্যসভায় যাওয়াটা প্রায় অনিশ্চিত হয়ে উঠল। এই হওয়া না হওয়ার দোলাচলের ভেতরে একদিন সকালবেলায় অরুণ সিং ফোন করে ডেকে পাঠালেন। ২এ, মতিলাল নেহেরু রোডে গিয়ে দেখা করতেই বললেন, 'চল, ইয়ার, ছে সাল তু অওর ম্যায় এম পি বনকে রহেঙ্গে।' আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তখনও এ আই সি সি থেকে সরকারীভাবে কোনও নাম ঘোষণা হয়নি। কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। রামদার বাড়িতে বেঙ্গল ক্যাম্পে প্রায় সবাই ছিল। তবু আমি তার ভেতর বীরেনদাকে ডেকে বললাম, বীরেনদা আমার টিকিট হয়ে গেছে। বীরেনদা বলল, 'চুপ, এখন কাউকে বলবি না। এখনও এ আই সি সি নাম ঘোষণা করেনি। এখানে যারা বসে আছে, তারাই গিয়ে তোর নাম শেষ মুহূর্তেও কাটা যায় কি না সে চেষ্টা করবে।' যতদূর মনে পড়ছে, ১৫ই কি ১৬ই মার্চ নাম ঘোষণা হল। ইতিমধ্যে আমি এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার হয়ে গেছি। মনোনয়নের শেষ দিন ছিল ১৯শে মার্চ। নির্বাচনের দিন ছিল ২৭শে মার্চ, আর স্ক্রুটিনি ২২শে মার্চ। যেহেতু কোনও লড়াই ছিল না, তাই ২২শে মার্চ-ই বিজয়ী বলে জানিয়ে দেওয়া হল।

পরে জেনেছিলাম, আমার জন্য রাজীবজী নিজে বরকতদার বাড়ি গিয়েছিলেন, এ কথা জানাতে যে আপনার কোনও ভয় নেই। ডি পি বেঙ্গলে রাজনীতি করবে না। ওকে আমার এখানে দরকার। আমি তাই ওকে আনতে চাইছি, আপনি দয়া করে আপত্তি করবেন না।

পরে, যখন বরকতদাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম, তখন উনিও বললেন, আমি রাজীবজীকে বলেছি, আমার কোনও আপত্তি নেই। ওকে আপনি এ আই সি সি'তে কাজে লাগান।

৩৫ বছর বয়সে রাজ্যসভায় গিয়েছিলাম, তা-ও রাজ্যে যখন একটিমাত্র আসন। তাই সকলের ভালো লাগেনি। 'আনন্দবাজার'-এ কলম লিখলেন গৌরকিশোর ঘোষ। তাঁর ক্যাপশন ছিল 'গৌরানন্দ কবি ভনে'। উনি লিখলেন, "পশ্চিম বাংলার বালসূর্য্য শ্রীমান মিঠু"। আমি জানতাম, এই ব্যঙ্গবিদ্রুপ, আমাকে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে জবাব দিতে হবে। এখনই কোনও প্রতিক্রিয়া দিয়ে লাভ

> প্রণবদা বললেন, 'উজবুকের মতো কথা বলো না। কোন কারণ না থাকলে একজন দক্ষ অফিসারকে ওরকম তাৎপর্যহীন জায়গায় পাঠিয়ে দেবে? ভালো করে খোঁজ নাও। জানতে পারবে ওর নির্বাসন কেন।' আমার সত্যি কি মিথ্যা জানবার সুযোগ ছিল না। তবে পরে জেনেছিলাম যে, ওঁরই প্রতিরক্ষা দপ্তরের একজন মহিলা সহসচিব ওঁর নামে ইন্দিরাজীর কাছে অভিযোগ জানানোর পরিণতিতে ওঁকে ওই নির্বাসনে যেতে হয়েছিল।

নেই। শুধু যখন স্নেহের সাথে 'যুগান্তর'-এর মিহিরদা বললেন, 'মিঠু, তুমি নিজে এই উত্তরণকে কীভাবে দেখছো?' আমি বলেছিলাম, 'আমার এই উত্তরণ দলের নীরব কর্মীদের প্রতীকী স্বীকৃতি। আমি কোনও প্রচারের আলোয় না এসে নীরবে দলের সম্পদ সৃষ্টি করবার যে ব্রত পালন করেছি, আজ রাজীবজী তার মান্যতা দিয়ে বলতে চেয়েছেন, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম কখনও বৃথা যায় না। দেরীতে হলেও তার স্বীকৃতি আসে।' শুরু হল এক নতুন যাত্রা।

।।৪০।।

১৯৮৪ সালটা ইউথ কংগ্রেসের কাছে একটা খুব গৌরবজনক বছর। আমরা ১৩ জন একসাথে রাজ্যসভায় মনোনীত হয়েছিলাম। না তা আর কখনও হয়েছে বা ভবিষ্যতে কখনও হবে।

আমি, সুরেশ সাচৌরি, পবন বনসল, আনন্দ শর্মা, ভুবনেশ্বর কলিতা, বাসুদেব পান্নিকর, কে ভি থাঙ্গাবালু, সুভাষ মোহান্তি, রউফ ডালিউল্লা, ইরশাদ মির্জা, পৃথিবী মাঝি— আর দু'জনের নাম মনে পড়ছে না। সবাই নিজের নিজের রাজ্যের যুব সভাপতি— আমি ও পানিক্কর বাদে।

আমার রাজনৈতিক জীবনের সাফল্যের শীর্ষস্থানে, এই সময়টাই আমায় পৌঁছে দিয়েছিল। ১৩ জন সাংসদ হলেও আমার প্রশিক্ষণজনিত কারণে নিজের অফিস, নিজের বাজেট, দলের আবণ্টিত নিজের বাহন— আমাকে একটা অসাধারণ উচ্চতা দিয়েছিল। আজ নাম বলে কাউকে ছোট করতে চাই না, কিন্তু এই রাজ্যে সেদিন যাঁদের মনে হয়েছিল— আর শরত সিন্‌হা বা শারদ পাওয়ারের কংগ্রেসের সদস্য হয়ে থাকার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই, তাঁরা সবাই আমার দিল্লির অফিসটাকে রাজীবজীর কাছে পৌঁছবার প্রবেশ্য পথ বলে মনে করতেন। আমার আজ রাজনৈতিক জীবনের সায়াহ্নে একটাই পরিতৃপ্তি। কাউকে অসম্মান করিনি, কাউকে হতাশ করিনি।

ইতিমধ্যে প্রশিক্ষিত ছেলেরা সবাই মাঠে। ৪০০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেকে নিয়ে ২০০টি জেলার ২০ দফা রূপায়ণের দায়িত্ব পালন করছিলাম। হিন্দি ভাষাভাষী রাজ্যগুলিতে আন্তঃরাজ্য নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হলেও দক্ষিণ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ভাষাগত সমস্যার কারণে আন্তঃজেলা নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া মেনে নিতে হল। তবুও বাংলার বেশ কিছু ছেলে অসমের বাঙালিবহুল জেলাগুলিতে যেতে আপত্তি করেনি।

বলেছিলাম ১০ মাস থাকতে হবে। প্রথম দু'মাস ফ্যামিলারাইজেশন। পরের মাসটায় মোটিভেশন ক্যাম্প। তারপর দু'জন ১৫ জন মোটিভেটরকে নিয়ে জেলার দু'টি দরিদ্রতম এলাকা বেছে নিয়ে implementation-এর কাজ করবে। এখানে আবার আর একটা 'পিয়ার গ্রুপ' তৈরি করতে হত, ক্লাস্টারপ্রতি ৫০ জন। এদের বলা হত রুরাল ইউথ ওয়ার্কার।

সবাই টিকে থাকতে পারেনি। সবাই খুব ভালো কাজ করেছে, তা-ও নয়। তবুও ৫ রাইসিনা রোডের অফিসে বিয়াল্লিশ হাজার রুরাল ইউথ ওয়ার্কারের নামের তালিকা জমা হয়ে গিয়েছিল।

সময়টা ১৯৮৪ সাল। তাই কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফেসবুকের যুগ শুরু হয়নি। তবুও সেই সময়ে যে প্রযুক্তি সর্বাধুনিক বলে পরিচিত ছিল, সেই 'ওয়ার্ড প্রসেসর' আমার অফিসে ছিল। তৃণমূল স্তরে ২০ দফা রূপায়ণের ব্যবহারিক চেহারাটা কী, আমার সেন্ট্রাল মনিটরিং ইউনিট থেকে প্রসেস করে প্ল্যানিং কমিশন, পি এম ও এবং ২এ, মতিলাল নেহেরু মার্গে (রাজীবজীর অফিস) পাঠানো হত।

তার ফলশ্রুতিতে, একবার প্ল্যানিং কমিশনের তদানীন্তন সদস্য সচিব শ্রী দেবু বন্দ্যোপাধ্যায় নবীন রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে আমাকে যে রিভিউ মিটিং-এ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সেখানে আমি যখন ছেলেদের পাঠানো রিপোর্টের ব্যবহারিক সমস্যাগুলি নিয়ে বললাম, মনে হল অনেকেই নতুন শুনছেন। ঘটনাচক্রে সে আলোচনায় লোকশিক্ষা পরিষদের শিবুদা, ইমসের বিপ্লব হালিম, মহাশ্বেতা দেবীও উপস্থিত ছিলেন। তার ফলে, শিবুদা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এবং বিপ্লব হালিমের সাথে আজও সম্পর্ক অটুট আছে। যদিও মহাশ্বেতা দেবী আর পরে চিনতে চাননি। সত্য বলতে কী, ২০ দফা ও তার ব্যাখ্যা তখন আমার কাছে ধর্মগ্রন্থের মতো হয়ে গিয়েছিল। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করতাম, ইন্দিরাজীর গরিবী হঠানোর যে ডাক, তাকে বাস্তবায়িত করবার এর চেয়ে কোনও ভালো হাতিয়ার হতে পারে না।

তাই যেখানে যেখানে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা যাচ্ছে, তার সংশোধন করবার জন্য উপযুক্ত জায়গাগুলিতে পরপর কড়া নাড়তাম। এমনকি পার্লামেন্টে আমার যে মেডেন স্পিচ, তা-ও ছিল ২০ দফাকে কেন্দ্র করে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যেই শুরু করেছি, তেলেগু দেশম-এর পি উপেন্দ্র বলে উঠেছিল, আমরা আমাদের রাজ্যে এই কর্মসূচী রূপায়ণে আগ্রহী নই। কারণ আমরা আরও বেশি জনমুখী কর্মসূচী রূপায়িত করছি। আমার মনে আজও আছে, আমি কী উত্তর দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আপনার রাজ্য ভারতীয় সংবিধান

আইকার্ডের সদর দপ্তরে প্রদর্শিত 'প্রতিবেদকের প্রকল্প', চিত্রপ্রদর্শনী দেখছেন শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী

বহির্ভূত কোনও রাজ্য নয়, সংবিধানে বলা আছে ভারত একটি গণতান্ত্রিক, সমাজবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র। তাই সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীকে রূপায়ণ করা আপনার দায়বদ্ধতা। উনি আবার টিপ্পনী কাটাতে আমি বলেছিলাম, IRDP-তে মানুষকে রোজগার দিশা, NREP-তে আবশ্যিকভাবে কর্মদিবস সৃষ্টি করা, গৃহহীনকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, গ্রামের ভূমিহীন ও ক্ষেত মজুরকে মহাজনী ঋণ থেকে মুক্ত করা, Public distribution system-কে আরও জনমুখী করে তোলা— এগুলি যদি সমাজবাদী কর্মসূচী না হয় তবে আপনার ভাষায় সমাজবাদ কী, বুঝিয়ে বলবেন কি?

খুব টেবিল বেজেছিল, যখন শেষ করলাম। আমার পাশেই কে কে বিড়লা বসতেন। ভাষণ শেষ হতেই বললেন, 'বাঃ ভাই, তুমি তো ভালো বলো!' আমি বললাম, 'আপনিও তো খুব ভালো বাংলা বলেন।' উনি বললেন, 'কে বলল আমি বাঙালি নই! আমার জন্ম, কর্ম— সব কলকাতায়। আমি তোমার চেয়ে বেশি বাঙালি। তুমি সোমবার আমার বাড়ি আসবে। আমরা একসাথে চা খাব।' অর্থাৎ সাত দিন পরে। ভেতরে ভেতরে একটু উত্তেজিত হচ্ছি। বিড়লা বলে কথা। তা-ও নিজের বাড়িতে। প্রতীক্ষিত সোমবার এল। ৫ নং তিরিশ জানুয়ারি মার্গের বাড়িতে গেলাম। চা-ও খেলাম। কিন্তু সেই উষ্ণতাটা দেখা গেল না।

বেশ কিছুদিন পর একদিন কিষাণ বাজোরিয়াজী বললেন, 'আপনার সাথে কি অমর সিংয়ের কোনও গোলমাল আছে?' আমি বললাম, 'কেন?' বললেন, 'না, আমরা ক'দিন আগে কে কে বিড়লার বাড়িতে একত্রিত হয়েছিলাম, উনি আপনার প্রশংসা করে কিছু বলছিলেন, তাতে অমর সিংয়ের কিছু বিরূপ মন্তব্য আমার ভালো লাগল না।' বুঝলাম, কলকাতা এয়ারপোর্টের চপেটাঘাতের বদলা নিয়েছে।

যাই হোক, ৪২ হাজার প্রশিক্ষিত কর্মীর তালিকা যার কাছে রয়েছে, তা-ও সারা দেশ জুড়ে, তার অমর সিংয়ের বিরোধিতা নিয়ে বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। বরং উত্তেজনা ছিল, এই শক্তিটাকে একবার এক জায়গায় এনে কবে দেখাতে পারব। এটা সেই সময়, যখন রাজীবজী দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে মানুষের যন্ত্রণা বুঝবার চেষ্টা করছেন। প্রায় সর্বত্রই কো-অর্ডিনেটর বা মোটিভেটর বা রুরাল ইউথ ওয়ার্কারদের সাথে দেখা হয়ে যাচ্ছে। এবং দেখা হলেই উনি তাদের কাছ থেকে আলাদা করে এলাকার feedback নিচ্ছেন।

সময়টা সহায় ছিল। আমি তাই একদিন প্রস্তাব দিলাম, 'যারা আপনার নামে

আমার পাশেই কে কে বিড়লা বসতেন। ভাষণ শেষ হতেই বললেন, 'বাঃ ভাই, তুমি তো ভালো বলো!' আমি বললাম, 'আপনিও তো খুব ভালো বাংলা বলেন।' উনি বললেন, 'কে বলল আমি বাঙালি নই! আমার জন্ম, কর্ম— সব কলকাতায়। আমি তোমার চেয়ে বেশি বাঙালি। তুমি সোমবার আমার বাড়ি আসবে। আমরা একসাথে চা খাব।'

নিজেদের সমাজসেবায় উৎসর্গ করছে, তারা একবার আপনার সরাসরি আশীর্বাদ পাবে না?' বললেন, 'বলো কী করতে হবে।' আমি বললাম, 'একটা জাতীয় স্তরে প্রশিক্ষিত কর্মীদের সম্মেলন হওয়া দরকার। ওরা একবার যদি সবাই সবাইকে দেখে, তা হলে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে এলাকায় ফিরে গিয়ে কাজ করবে।'

অনুমোদন পাওয়া গেল। প্রস্তুতিও শুরু হল। ইন্দিরা গান্ধি স্টেডিয়ামে একদিনের সম্মেলন। ৩রা নভেম্বর ১৯৮৪। রাজীবজী চেয়েছিলেন, ইন্দিরাজীও দেখুন, দলের সম্পদ কোথায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই প্রধান বক্তা হিসেবে ইন্দিরাজীর সম্মতি নেওয়া হল। বাজেট হল প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। তার ভেতর special train-এর জন্যই ৩৮ লক্ষ টাকা দিতে হবে। ১৬টা special train ঠিক হল। ব্যাপক প্রচার-পোস্টারে, ব্যানারে দিল্লি ছয়লাপ।

Man proposes, God disposes. ৩০শে অক্টোবর প্রথম খবর এল আগরতলা থেকে। গৌহাটি থেকে ট্রেন ধরবার জন্য ছেলেরা রওয়ানা দিয়েছে। ৩১শে অক্টোবর সকাল ৯টায় খবর এল, ইন্দিরাজী গুলিবিদ্ধ।

কতবার কেঁদেছি, মনে নেই— এবং কতদিন ধরে। কারণ, যখন শেষকৃত্য হচ্ছে, ধীরেন ব্রহ্মচারী চিতার ওপর শেষ শয্যা বিছোচ্ছেন, আমার কান্না দেখে, সাত্তারদা (তদানীন্তন কৃষিমন্ত্রী), যিনি আমার পেছনে বসেছিলেন, আমাকে কোলে টেনে নিয়ে বাচ্চা ছেলেকে শান্ত করার মতো প্রবোধ দিচ্ছিলেন, 'ভগবান চায়নি, তুমি, আমি কী করে ওঁকে বাঁচিয়ে রাখব!'

(ক্রমশ)

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

জয়েন্ট ফোরামের গেট মিটিং

রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে চা-বাগানের ন্যূনতম মজুরি আইন অথই জলে

জলপাইগুড়ির চা শ্রমিক আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতৃত্ব মানিক সান্যাল সদ্যপ্রয়াত। চা শ্রমিক আন্দোলন এবং ডুয়ার্সের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মানিক সান্যালের অবদান যে কেউই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। এখনকার এই সময়কালে মানিক সান্যালের বা চিত্ত দে-র বাগিচা শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলনকে মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন কাজ। মানিক সান্যালদের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে বর্তমানে বাগিচা শ্রমিকদেরকে নিয়ে যাঁরা প্রতিনিয়ত লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করছেন, তাঁদেরই একজন কমরেড জিয়াউল আলম। জয়েন্ট ফোরামের বরিষ্ঠ নেতৃত্ব জিয়াউল আলম বর্তমান চা-শিল্প এবং শ্রমিক স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিলেন 'এখন ডুয়ার্স'-এর বিশেষ প্রতিনিধি **ভীষ্মলোচন শর্মাকে**। আজ ২২তম পর্ব।

চায়ের ডুয়ার্স ডুয়ার্সের চা

চা-বলয়ের বর্তমান যা গতিপ্রকৃতি, তাতে ন্যূনতম মজুরি নাকি ফের অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি চুক্তি সম্পাদিত হবে, সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সর্বত্র। চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রদানের দাবিতে ডুয়ার্স তরাইয়ের বাগানগুলিতে গেট মিটিং পর্ব শেষ। গেট মিটিং-এর প্রভাব চা-বাগানগুলিতে বেশ ভালরকমই পড়েছে। এমনকি খবরের সত্যতা চা মালিকরাও স্বীকার করে নিয়েছে। ২ জুন, ২০১৭ উত্তরকন্যাতে কয়েকটি শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পেশ করা চা শ্রমিকদের অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি চুক্তি সম্পাদনের জন্য একটি দাবিসনদের উপর ডাকা দ্বিতীয় বৈঠকও ব্যর্থ। জয়েন্ট ফোরাম এবং বিটিডব্লিউইউ ন্যূনতম মজুরির দাবিতে অনড় থেকে অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি নিয়ে আলোচনার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বয়কট করে। গরমাগরম আন্দোলনের আবহে ৯ জুন শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় ন্যূনতম মজুরি ইস্যুতে গঠিত ২৯ সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকও সিদ্ধান্তবিহীন এবং

অবশেষে ১২ জুন চা-শিল্পে এবং ১৩ জুন চা-শিল্প সমেত উত্তরের চা অধ্যুষিত জেলাগুলিতে জয়েন্ট ফোরামের পক্ষ থেকে ধর্মঘট পালন করা হয়। এবারে এই লেখা যখন মুদ্রিত হবে, তখন পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে, আগাম অনুমান করা খুবই শক্ত ব্যাপার। কারণ ৩ অগাস্ট বিধানসভা অভিযান হাজার হাজার শ্রমিকশ্রেণির যৌথ আন্দোলনে একটা আলাদা মাত্রা এনে দিলেও সরকারপক্ষ নীরব।

জয়েন্ট ফোরামের প্রবাদপ্রতিম নেতৃত্ব জিয়াউল আলম 'কমরেড জিয়াদা' নামেই সমধিক পরিচিত। স্বর্গত মালিক সান্যাল, চিত্ত দে পরবর্তীকালে জয়েন্ট ফোরাম গঠন করে চা-শিল্প শ্রমিক তথা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব হিসাবে নিজেকে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন কমঃ জিয়াউল আলম। ভারতবর্ষে সুদূর অতীতকাল থেকে যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল উত্তরের মাটিতে যে চা-শিল্পের, সেই চা-শিল্প নানান ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত। চা-শিল্পের ক্রমবর্ধমান সমস্যা নিয়ে 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম কমরেড জিয়াউল আলমের কাছে। সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকারে জিয়াউল আলম তুলে ধরলেন সাম্প্রতিককালের চা-শিল্পের ভয়াবহ সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে।

এখন ডুয়ার্স: চা-শিল্পের বর্তমান সংকট, সমস্যা এবং উত্তরণের পথ বিষয়ক আপনার ভাবনাচিন্তা কী?

জিয়াউল আলম: চা শ্রমিকদের এই আন্দোলনে কোনও রাজনীতি নেই। এটা শ্রমিকদের বেঁচে থাকার আন্দোলন। রাজ্য সরকার যে চা শ্রমিকদের নিয়ে উদাসীন, তার প্রমাণ বারবার বৈঠক ডাকলেও কত টাকা মজুরি দেওয়া হবে, সে সম্পর্কে একটাও বাক্যব্যয় করা হচ্ছে না। অন্তর্বর্তী মজুরির কথা এখন নতুন করে ভেসে উঠলেও জয়েন্ট ফোরাম ন্যূনতম মজুরিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। ন্যূনতম মজুরির জন্য যদি আরও দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়, তাতেও শ্রমিকরা পিছপা হবে না। ন্যূনতম মজুরির পাশাপাশি এই ধর্মঘটের আরও দু'টি ইস্যু হল জাতীয় খাদ্যসুরক্ষা আইন (এনএফএসএ)-এর র‍্যাশন ব্যবস্থা চা-বাগিচায় চালু হওয়ার পর থেকে বন্ধ থাকা বাগান মালিক প্রদত্ত মজুরি বাবদ র‍্যাশন দ্রুত চালু এবং সমস্ত বন্ধ চা-বাগান খোলা, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হতদরিদ্র চা শ্রমিকদের বেঁচে থাকার মতো মজুরি পাওয়ার ধর্মঘটকে হুমকি দিয়ে বানচাল করার চেষ্টা করলেও আখেরে তা সফল করতেই সাহায্য করছে, শ্রম দপ্তরকে দিয়ে তিনি দফায় দফায় যে বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়েছেন তা শ্রমিকদের মনের ক্ষোভের আগুনে ছাই হয়ে যাবে। তাই দলমতনির্বিশেষে সকলের কাছেই জয়েন্ট ফোরাম যে আবেদন জানিয়েছিল, মানুষের স্বার্থে ধর্মঘট সফল করার জন্য তা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, বিধানসভা ভবন অভিযানও সাফল্যমণ্ডিত হবে।

এখন ডুয়ার্স: ধর্মঘটই কি সমস্যা সমাধানের পথ?

জিয়াউল আলম: তা কেন? ধর্মঘটকে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান বেআইনি ঘোষণা করেছে। তবুও তা ধোপে টিকবে না। ১৭ এপ্রিল শ্রম দপ্তরকে ধর্মঘটের আগাম নোটিশ দেওয়া ছিল। ২৯ এবং ৩০ মে প্রতিটি বাগানে ধর্মঘটের চূড়ান্ত নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য সরকারই শ্রমিকদের ধর্মঘটে নামতে বাধ্য করেছে। ২০১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের পর তার মেয়াদ দু'বছর থাকবে বলা হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে কিছুতেই হয়নি। জয়েন্ট ফোরাম দু'বছর পেরনোর পরেই আন্দোলনে নেমেছে। চা শ্রমিকদের মজুরি র‍্যাশন বন্ধ থাকলেও তা এখনও চালু করতে রাজ্যই গড়িমসি করছে। ফলে ধর্মঘটে যাওয়া ছাড়া উপায় কী?

এখন ডুয়ার্স: চা-শিল্পের সমস্যা কি আদৌ সমাধানযোগ্য? আপনার চোখে সমস্যা সমাধানের স্থায়ী এবং নিশ্চিত পথ কি কিছু আছে?

জিয়াউল আলম: এক এবং অদ্বিতীয় চা-শিল্পের উৎপাদন, বাণিজ্য এবং মুনাফার হার ধারাবাহিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী। পাঁচের দশকে চা উৎপাদিত হত ৫০০ মিলিয়ন কেজি, বর্তমানে ১৩০০ মিলিয়ন কেজি। শিল্প বাণিজ্যগতভাবে চা-শিল্পে সমস্যা বা সংকট নেই। '৮০-র দশক পরবর্তীকালে কেন্দ্র শিল্প-বাণিজ্য নীতিতে উদীয়মান শিল্পের নামে কিছু আধুনিক উৎপাদনক্ষেত্র ও পরিষেবাক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে। ক্রমে সরকারের অভিমুখ সরে যায়। চা-শিল্প কেন্দ্রীয় আইন দ্বারা পরিচালিত। ১৯৫৩ সালের টি প্ল্যান্টেশন আইন অনুযায়ী বাগিচাক্ষেত্র পরিচালিত হয়। ফলে আইনের বাইরে গিয়ে কেউ চা গাছ রোপণ, ফ্যাক্টরি নির্মাণ বা চা বিক্রি করতে পারে না। যতদিন এই আইনকে সঠিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং মালিকগোষ্ঠী মান্যতা দিয়েছে, ততদিন গুণগতমান পৃথিবীখ্যাত ছিল। এই পর্বে বন্ধ বাগান ছিল না, কোথাও সমস্যা হলে মালিকানা নিয়ে নিজস্ব সমস্যা, মালিকানার হাত পরিবর্তন হলেও বাগান বন্ধ হয়নি। তিন-চার-পাঁচ দশক পিছনে তাকালে দেখা যায়, এত বকেয়া কোনও দিন পড়ে থাকেনি। ভবিষ্যনিধি, গ্র্যাচুইটি কোনও কিছুই পাচ্ছে না শ্রমিকরা। ফলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান না হলে ধারাবাহিক তীব্র লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি মান্যতা পাবেই।

এখন ডুয়ার্স: সমস্যার সূত্রপাত কি '৮০-র দশক থেকেই?

জিয়াউল আলম: '৮০-র দশক-পরবর্তীকালে সরকারের চোখে চা-বাগিচাগুলি দুয়োরানি, ধারাবাহিকভাবে অবহেলিত। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এই সরকার নীতিগত কারণে নিয়ন্ত্রণবিধি তুলে দেয়। ফলে ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ বিনিয়োগ করতে থাকে তা ফেরত আসার কোনও সমীক্ষা বা ধারণা ছাড়াই বিনিয়োগ করতে থাকে। এই সুযোগে কিছু সাধারণ ব্যবসায়ী মুনাফার জন্য বাগানের মালিক হয়ে ওঠে। ব্যাঙ্কের পরিচালনব্যবস্থাও এর জন্য দায়ী। মালিকপক্ষকে ব্যাঙ্কও অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করেছে। ইউবিআই ছিল চা-বাগিচায় লিড ব্যাঙ্ক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রবীন পালের রেড ব্যাঙ্ক, ধরণিপুর, সুরেন্দ্রনগর, ২২ কোটি টাকা বকেয়া থাকা অবস্থাতে ইউবিআই-এর কাছ থেকে আবার লোন পায়। এই ফাটকাবাজি, ব্যাঙ্কের অনৈতিক অর্থনৈতিক কারবার, সরকারের উদাসীনতা, টি বোর্ডের পরিচালনগত অদক্ষতা '৮০-র দশকের পর থেকে যে মাত্রাছাড়া হতে শুরু করেছিল, সেটাকে অস্বীকার করা যায় না।

এখন ডুয়ার্স: চায়ের টাকায় তো ফাটকা পুঁজির খেলা চলছে? চিটফান্ড গোষ্ঠী সক্রিয় চা ব্যবসাতে। কী বলবেন?

জিয়াউল আলম: চিটফান্ড সক্রিয় চা-বাগানগুলিতে। কে ডি সিং-এর অ্যালকেমিস্ট গ্রুপ দার্জিলিং, ডুয়ার্সের বাগানগুলিতে শোষণের জাল বিস্তার করেছে। '৯০ দশক-পরবর্তীকালে ফাটকা পুঁজির আমদানি ঘটে। বছর পাঁচ-ছয় থেকে চিটফান্ড গোষ্ঠী ব্যাঙ্কের সহায়তায় কিছু বাগানের মালিক হয়। তার মধ্যেই কে ডি সিং-এর দার্জিলিঙের বিখ্যাত ছ'টি বাগানের সঙ্গে ডুয়ার্সের বান্দাপানিসহ আরও কয়েকটি ধুঁকছে।

এখন ডুয়ার্স: সার্ভেতে গিয়ে দেখলাম বীরপাড়া-মাদারিহাট বেল্টে সংকট সবচেয়ে বেশি। শ্রমিকের মারাত্মক ফাঁকিবাজি, বাগান না খুলতে দেবার প্রবণতা, ডানকানসের ফাটকা মুনাফার সর্বগ্রাসী চরিত্র। ওখানকার ভয়ংকর সমস্যা নিয়ে সংগঠনগতভাবে কী ভাবছেন?

জিয়াউল আলম: বৃহদায়তন চা

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ছিল ডানকানস। কর্পোরেট হাউস ১৫-২০ বছর আগেও শ্রেষ্ঠতম ছিল। মুক্ত বাজার অর্থনীতি পর্বে সার কারখানার মালিক। কারণ সার কারখানার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, ধারাবাহিকভাবে সরকারের কাছ থেকে ভরতুকি পায়। চা-বাগিচার পয়সা ঢালল সার কারখানায়। শ্রমিকের পিএফ, গ্র্যাচুইটির টাকা। আসলে বৃহদায়তন বাগিচাগুলির ডুবে যাওয়ার অন্যতম কারণ অদূরদর্শিতা, ফাটকাবাজি, মুনাফা কামানোর ঝোঁক। লাখের কাছাকাছি মানুষ ধুঁকছে। ডানকানসের ৭টি বাগানের সৌজন্যে বাণিজ্য-ব্যবসায় রমরমা ছিল বীরপাড়ার। এখন বীরপাড়া বাজার শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সংগঠনগতভাবে, কী কেন্দ্র কী রাজ্য— উভয় সরকারেরই ভূমিকা নিয়ে আমরা ক্ষুব্ধ। টি বোর্ডেরও কোনও পরিকল্পনা নেই, কোনও পথনির্দেশ নেই। ’৮০-র দশক-পরবর্তীকালে কাঠামোগত পরিবর্তনের স্বরূপ বলার আগে বীরপাড়া-মাদারিহাট বা কালচিনি ব্লকের অন্য কিছু সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে, যেগুলি নিয়ে জয়েন্ট ফোরামও চিন্তিত। বান্দাপানি, রামঝোরা, ঢেকলাপাড়া, মধু, বামনডাঙা, রাধারানি, সেন্ট্রাল ডুয়ার্স অত্যন্ত সংকটে। ’৮০-র দশক-পরবর্তীকালে খনিজ উত্তোলন করা হচ্ছে চা-বাগিচা সংশ্লিষ্ট ভুটান পাহাড় এবং তার আশপাশের অঞ্চল থেকে। ’৯২-’৯৩ সালে ভুটান থেকে ‘নেপালি খেদাও’ আন্দোলনের ফলে বহু মানুষ উৎখাত হয়ে এসে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করছে এইসব এলাকায়। এদের একাংশ চা-বাগিচাগুলিতে কর্মরত— কেউ শ্রমিক, চৌকিদার, দারোয়ান, চাপরাশি বা পিয়োন হিসাবে। কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন তাদের অপারেশনের সময় গভীর জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে বেচে দিতে থাকে। ফলে চা-বাগিচা সংশ্লিষ্ট ভুটান পাহাড়ে বৃক্ষচ্ছেদন, খনিজ উত্তোলনের জন্য ডিনামাইট বিস্ফোরণের ফলে প্রচুর পরিমাণে ডলোমাইট নদীর জল বাহিত হয়ে প্রবেশ করছে চা-বাগিচাক্ষেত্রে। আমরা জানি, ডলোমাইট মাটিকে বন্ধ্যা করে দেয়, অনুর্বর করে তোলে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জমি বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। ডলোমাটি মিশ্রিত ঝোরার জল বর্ষার সময় প্রবেশ করছে চা-বাগিচাক্ষেত্রে। জমির উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে। জলজ্যান্ত উদাহরণ নিউল্যান্ডস, কোহিনুর, সেন্ট্রাল ডুয়ার্স। ইন্দো-ভুটান কমিটি থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার চা-শিল্প সংকট মেটাতে তৎপর হয়নি। ভুটানের খনিজ উত্তোলন, গাছ কাটা, ভারত সরকারের উদাসীনতা চা-শিল্প সংকটের একটা বড় কারণ।

এখন ডুয়ার্স: একদিকে দায় ও দায়িত্ব, অন্য দিকে দায়হীন ক্ষুদ্র চা চাষি ও বটলিফ ফ্যাক্টরি। ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় বট্‌লিং কনসেপ্ট। জয়েন্ট ফোরামের নেতৃত্ব হিসাবে উদ্ভূত এই পরিস্থিতি নিয়ে কী ভাবছেন?

জিয়াউল আলম: ’৮০-র দশক-পরবর্তীকালে কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছে। চা-পাতা তুলে এনে টার্ফে প্রসেস করিয়ে গুণগতমানের পরিবর্তে পরিমাণগত রূপান্তর ঘটছে চা-শিল্পে। চা মালিকদের একটা অংশ অনুৎপাদক জমি কিনে নিয়ন্ত্রণবিহীন অবস্থাকে আরও মজবুত করল। তৈরি হল বটলিফ ফ্যাক্টরি। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি অর্থনীতিরও একটা রূপান্তর ঘটল। চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হল জীবন এবং জীবিকার প্রশ্নে। নতুনভাবে গড়ে ওঠা লক্ষ লক্ষ একর জমি চা চাষের কাজে লাগানো হতে লাগল। বটলিফ ফ্যাক্টরিতে নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপের ধরন তৈরি হয়নি বলে ক্ষুদ্র চা চাষিরাও বটলিফ ফ্যাক্টরির মালিকদের কাছে ঠকছে। শ্রম আইনের অস্তিত্ব না থাকার ফলে ক্ষুদ্র চা-শিল্পও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তরাই ও ডুয়ার্সের টি এস্টেটের জয়েন্ট ফোরামের নেতা জিয়াউল আলম

এখন ডুয়ার্স: দার্জিলিঙের সাম্প্রতিক মাসাধিককাল ধরে চলা আন্দোলনে চা-শিল্পের উপর কী ধরনের সংকট আসতে পারে?

জিয়াউল আলম: দার্জিলিং চা দার্জিলিঙেই হয়। বিশ্বের আর কোথাও হয় না। দার্জিলিং চায়ের শতাব্দীপ্রাচীন নির্দিষ্ট ইউরোপিয়ান বাজার আছে, তাদের ক্রেতা আছে। উৎপাদন বন্ধ হয়ে তাদের কাছে চা না পৌঁছালে সেটা অন্যায় হবে। দার্জিলিং চায়ের বিকল্প নেই। অভ্যাস এবং নেশা দুইয়ের জন্যই দার্জিলিং চা অনন্য। ক্রেতা খুঁজছে চা অথচ পাচ্ছে না। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়েই দার্জিলিং প্রসঙ্গে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার ফলে ইউরোপে ভারতীয় চায়ের বাজারও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল, দার্জিলিং চায়ের ক্রেতারা অনন্যসাধারণ স্বাদ দার্জিলিং চায়ের রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হল, তাই দেশ এবং রাজ্যের স্বার্থে দ্রুত দার্জিলিঙের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সমাধান হওয়া প্রয়োজন। কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতি শুধুমাত্র নয়, বাজার হয়ত ফিরে পাওয়া যাবে, কিন্তু ক্রেতাদের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করা হল। তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি মনে করেছিলেন, দার্জিলিংকে উত্তেজিত করলে নেপালি, বাঙালি, আদিবাসীদের মধ্যে মেরুকরণ ঘটানো যাবে। এক সংকীর্ণ রাজনীতি কায়েম হয়েছে রাজ্যে। বোকামি করে দার্জিলিংকে উত্তপ্ত করার মূল কারণ ছিল এটাই। সকলকে সম্মান করা এবং সকল মত ও পথের মানুষকে মেনে নেওয়াকে উনি অবমানিত করেছেন। দার্জিলিং চায়ের যে ক্ষতি এবং সামগ্রিক পর্যটনের যে সমূহ ক্ষতি, তার জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রীর সংকীর্ণ রাজনীতি। ৮ জুন মুখ্যমন্ত্রীর দার্জিলিঙের মানুষের প্রতি আচরণ ছিল অসৎ উদ্দেশ্যের রাজনীতি। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ অধিকার আদায়ের জন্য যে লড়াই তা অশুভ শক্তিকে মেরুকরণের সুযোগ নিতে দেয়নি। শ্রমিকসত্তার ঐক্যবদ্ধ মঞ্চের সামনে তাই বড় চ্যালেঞ্জ শান্তি এবং সুস্থিতি নষ্ট হতে না দেওয়া। কিছু কিছু অশুভ শক্তির তরফে প্রয়াস থাকলেও তারা সাফল্যলাভ করতে পারেনি, পারবেও না।

এখন ডুয়ার্স: আপৎকালীন মজুরি নয়, ন্যূনতম মজুরিই তো আপনাদের দাবি। অথচ এখন ১৩২.৫০ টাকা মজুরি মাত্র। শিল্প পরিকাঠামোবিহীন এই শিল্পক্ষেত্রে সবচেয়ে কম মজুরি চা-ক্ষেত্রে। এবার কি সরকারের সঙ্গে বা মালিকপক্ষের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ বা অসহযোগ?

ন্যূনতম মজুরীর দাবিতে পথসভা

জিয়াউল আলম: চায়ের এলাকার প্রসার, উৎপাদন বৃদ্ধি, বাণিজ্যের বৃদ্ধি, শিল্পগত বৃদ্ধি বা বিকাশের উলটো ছাপ শ্রমিকদের জীবনে। কারণ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের শ্রম আইনগুলি সংস্কারের নামে শ্রমিকশ্রেণির যুক্ত মঞ্চের আন্দোলনকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনাকে মদত দিচ্ছে বৃহত্তর মালিকপক্ষ। বৃহত্তর মালিক সম্প্রদায় চা উৎপাদনের সঠিক খরচখরচা কমানোর নামে চা-শিল্পের ক্ষেত্রে অন্যতম বাগিচা শ্রম আইনকে যেমন লঙ্ঘন করছে, তেমনই অন্যান্য আইন, সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক আইনও ধারাবাহিকভাবে লঙ্ঘন করছে। ২০১০ সালে চা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ কোঅর্ডিনেশন কমিটির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ‘ওয়েজ বোর্ড’ গঠনের জন্য আবেদন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে চিঠি লিখে সরকারিভাবে চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া হয়, ওয়েজ বোর্ডের প্রাসঙ্গিকতা থাকলেও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ন্যূনতম মজুরি বা ‘মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট’ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক এবং তা রূপায়ণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের। এই পর্বে সারা দেশে শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের ন্যূনতম মজুরির দাবিতে ধারাবাহিক লড়াই সংগঠিত হতে থাকে। দেশব্যাপী ধারাবাহিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব চা-শিল্পেও পড়ে।

এখন ডুয়ার্স: জয়েন্ট ফোরাম গঠনের প্রেক্ষাপটই বা কী, আর জয়েন্ট ফোরাম কীভাবেই বা ন্যূনতম মজুরি নিয়ে আন্দোলন করছে?

জিয়াউল আলম: ২০১২ সালে দু’দিনের সারা ভারত শ্রমিক ধর্মঘটকে সামনে রেখে দেশের অগ্রণী শ্রমিক নেতাদের উপস্থিতিতে শিলিগুড়িতে মহতী সমাবেশ হয়। এই সমাবেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান পর্বে চা শ্রমিকদের ঐক্যের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে জয়েন্ট ফোরামের পথ চলা শুরু হয়। ’১৪ সাল-পরবর্তীকালে রাজ্যে চা-শিল্পে মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাড়ে চার লক্ষ চা শ্রমিক ন্যূনতম মজুরি আইনের দাবিতে ধারাবাহিক আইনি সংগ্রামে মুখর হয়ে ওঠে। জয়েন্ট ফোরাম ২৬টি শ্রমিক সংগঠনের মঞ্চ। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর চা শ্রমিকরা তাদের শ্রমিকসত্তা নিয়ে জয়েন্ট ফোরাম গঠন করে। ন্যূনতম মজুরি ছাড়াও ‘প্রজাপাট্টা’ অর্থাৎ দুই শতাধিককাল ধরে বংশপরম্পরায় নিজস্ব বাস্তুজমিহীন যারা আছে, তাদেরকে জমির অধিকার প্রদান করার দাবি তোলা হয়। জমির অধিকার ব্যতিরেকে তারা কখনও বন্ডেড লেবার থেকে মুক্ত হতে পারে না। জমির অধিকার না পেলে তারা কখনও ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত আদিবাসী বা ভাষাগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে তাদের অধিকার সঠিকভাবে অর্জন করতে পারবে না। রাজ্যের চা-শিল্প অধ্যুষিত এলাকার মানুষজনও তাদের বসবাস বা ব্যবসার জন্য জমির অধিকার পায়নি। প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জমি আনরেগুলেটেড। বন, চা-বাগান, মিলিটারি, পিডব্লিউডি প্রমুখ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর আনরেগুলেটেড ল্যান্ড পেয়েছে একরের পর একর। কিন্তু উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির চালিকাশক্তি চা শ্রমিকদের বাস্তুজমির অধিকার দেওয়া হয়নি। রাজ্যের চা-শিল্প অধ্যুষিত এলাকায় শ্রমিকরাও তাদের বসবাস বা ব্যবসার জমির অধিকার পায়নি। খণ্ড খণ্ড জমি ব্রিটিশরা চা-বাগান মালিক, ভারতীয় সেনাবাহিনী, বনবিভাগ, অথবা পিডব্লিউডি-কে দিয়েছে দার্জিলিং পাহাড়সহ, কিন্তু উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মেরুদণ্ড চা শ্রমিকরা জমির অধিকার পায়নি। একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান পর্বে বিস্তীর্ণ পশ্চাৎপদ আদিবাসী ভাষাগত ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের জমির অধিকার প্রদান ব্যতিরেকে এলাকার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশের বিকাশ সম্ভব নয়। জমির অধিকার না থাকার কারণে যতটুকু উন্নতি দেশ বা জাতির হোক না কেন, এরা পিছিয়ে পড়ছে। বৈষম্যের চরম শিকার এরাই।

’১৪ সাল-পরবর্তীকালে রাজ্যে চা-শিল্পে মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাড়ে চার লক্ষ চা শ্রমিক ন্যূনতম মজুরি আইনের দাবিতে ধারাবাহিক আইনি সংগ্রামে মুখর হয়ে ওঠে। জয়েন্ট ফোরাম ২৬টি শ্রমিক সংগঠনের মঞ্চ। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর চা শ্রমিকরা তাদের শ্রমিকসত্তা নিয়ে জয়েন্ট ফোরাম গঠন করে। ন্যূনতম মজুরি ছাড়াও ‘প্রজাপাট্টা’ অর্থাৎ দুই শতাধিককাল ধরে বংশপরম্পরায় নিজস্ব বাস্তুজমিহীন যারা আছে, তাদেরকে জমির অধিকার প্রদান করার দাবি তোলা হয়। জমির অধিকার ব্যতিরেকে তারা কখনও বন্ডেড লেবার থেকে মুক্ত হতে পারে না।

এখন ডুয়ার্স: আপনার প্রস্তাব কী? চা শ্রমিকদের স্বার্থে সরকারের আশু করণীয় কাজ কী?

নারী শ্রমিকেরাও লড়াইয়ের ময়দানে

জিয়াউল আলম: তরাই-ডুয়ার্সের চা শ্রমিকের জীবন-জীবিকার বিকাশে অনন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারত ভূখণ্ডের প্রতি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে বিশেষ নজর দিতেই হবে। অত্যন্ত সহনশীলতার সঙ্গে এলাকার মানুষের জীবন এবং সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যিক। কারণ এরাই ডুয়ার্স ও দার্জিলিং ভূখণ্ড, সমগ্র ভারত ভূখণ্ডের সংযোগস্থল। দেশের স্বার্থেই এলাকার সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারকে সবসময়েই দূরদর্শী এবং সাবধানী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

এখন ডুয়ার্স: ঘুরে-ফিরে সবশেষে আবার ওই একই প্রসঙ্গে আসি যে, তাহলে ন্যূনতম মজুরির দাবি মান্যতা পাচ্ছেই?

জিয়াউল আলম: দেখুন, আগেই বলেছি, ২০১৪ সাল-পরবর্তীকালে রাজ্য সরকার ন্যূনতম মজুরি আইন চালু করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু চা-শিল্পগোষ্ঠীর প্রতি রাজ্যের বর্তমান সরকারের বিশেষ ঝোঁক থাকার কারণে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির অধিকারকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে সরকারের ঢিলেমি এবং টালবাহানা চলতেই থাকে। ইতিমধ্যেই দেশের খাদ্যসুরক্ষা আইনের বলে দেশের নাগরিক হিসাবে চা শ্রমিকদের খাদ্যসামগ্রী রাজ্য সরকার বিশেষ নির্দেশবলে কেড়ে নেয় এবং মালিকদের হাতে তুলে দেয়। দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্যের সার্বিক সমীক্ষায় চা শ্রমিক পরিবারের মানুষ পিছিয়ে আছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই মালিকদের ন্যূনতম মজুরি আইন ও শ্রম আইন না মানার হুমকির বিরুদ্ধে একযোগে চা শ্রমিকরা ১২-১৩ জুন সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করে, যেখানে চা শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকার সাধারণ মানুষও সংহতি জানায় এবং ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে আসে। চা শ্রমিকদের লড়াই-আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার ন্যূনতম মজুরি আইন দিনপ্রতি ২৫৬.৫০ টাকা ঘোষণা করে। কিন্তু এটা লজ্জার এবং চরমতম আক্ষেপের যে, তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের নামে রাজ্যের শাসকদলের কতিপয় ব্যক্তি চা কারখানার একাংশের মালিকদের সঙ্গে বসে সরকার ঘোষিত টাকার বদলে ১৬০ টাকা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে। রাজ্য সরকারের মালিকদের প্রতি আসক্তি এবং কতিপয় ব্যক্তির শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ভূমিকাকে প্রতিহত করার এই সময়কালে রাজ্যের ধর্মঘটি চা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকদের একাংশ অমানবিক আচরণ করল। এই হতদরিদ্র ধর্মঘটি চা শ্রমিকদের এবং মহিলা শ্রমিকদের বেপরোয়াভাবে লাঠিপেটা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হল না পুলিশ আধিকারিকদের একাংশ। তাই চা শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকাকে বাঁচানোর জন্যই ৩ অগাস্ট বিধানসভা এবং রাজভবন অভিযান এবং ৯ অগাস্ট কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রীর সঙ্গে ন্যায্য দাবিগুলির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হবে। রাজ্যের চা শ্রমিকদের ধরে রাখতে হলে চা-শিল্প অধ্যুষিত এলাকায় ন্যূনতম মজুরি ও জমির অধিকারের দ্রুত রূপায়ণ আবশ্যিক। শুধুমাত্র চা শ্রমিকদের নিজ স্বার্থেই নয়, এলাকার আর্থ-সামাজিক বিকাশে সরকারি অবহেলা এবং টালবাহানা দীর্ঘায়িত হলে রাজ্যের চা শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে আগামীতে আরও বৃহত্তর সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পিছপা হবে না, যার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে। উত্তরবঙ্গের সংহতি, বিকাশ, শান্তি নিশ্চিত করার স্বার্থে জয়েন্ট ফোরামের লড়াই চলবেই।

স্বাধীনতা দিবস! এ কোন মুক্তি?

স্বৈরতন্ত্র থেকে মুক্তি

স্বৈরতন্ত্র নিয়ে কথা হলে হিটলারের কথাই উঠবে প্রথমে। তাঁর নাৎসি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল পশ্চিমি দুনিয়া। পূর্ব ইউরোপের থেকে এগিয়ে এসেছিল সোভিয়েত রাশিয়া। কিন্তু তারপর কী হল? যে সোভিয়েত নাৎসি তাড়িয়ে মুক্তি আনল পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে, তারাই শেষমেশ নাৎসিদের ঢঙে শুরু করল দাপট। যুদ্ধের রেশ কাটতে না কাটতেই দেখা গেল, ওইসব দেশের প্রত্যেকটিতেই একটা করে পুতুল সরকার বসিয়েছে সোভিয়েত। চলছে খবরদারি আর স্বৈরাচার। নিজেদের দেশেও বিরুদ্ধ মত সহ্য করতে পারতেন না স্তালিন। ফলে যাঁরা বিদ্রোহী, তাঁদের উপর চলেছিল নির্মম অত্যাচার। সাইবেরিয়ায় নির্বাসন, জেলখানায় পচিয়ে মারা, গুম খুন। এত কিছুর পরেও টিকল না সোভিয়েত সাম্রাজ্য। ক্রুশ্চেভ আসার পর একের পর এক স্তালিন নীতির ঠিকানা হল আস্তাকুঁড়। চলল ডি-স্ট্যালিনাইজেশন। আরও পরে গর্বাচেভের সময় ঢুকে পড়ল খোলা হাওয়া। গ্লাসনস্ত। সেই উদ্দাম হাওয়ায় ভেঙে পড়ল সোভিয়েত, ভাঙল বার্লিনের পাঁচিলও।

এই সে দিন যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়ো হয়েছিলেন তাহরির স্কোয়্যারে। বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা মানুষ। দাবি একটাই— 'হোসনি মুবারক কুরসি ছাড়ো।' এই ছবি আরব বসন্তের একেবারে গোড়ার দিকের। তার আগেই মিশরের মানুষকে পথ দেখিয়েছে তিউনিশিয়া। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে তেইশ বছরের রাজপাট ছেড়ে পিঠটান দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বেন আলি। হোসনি মোবারককে টেনে নামিয়ে সেই ঢেউ তরঙ্গ তুলল লিবিয়া, ইয়েমেন, বাহরিন, সিরিয়া— একের পর এক দেশে। কোথাও ডিক্টেটরকে তাড়া করে খুন করছে জনতা, কোথাও বিপ্লব তেড়ে আসছে আঁচ করে আগেভাগেই সরকারকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। আরব দেশগুলোর সাধারণ মানুষ মেতে উঠল মুক্তির নেশায়। স্বৈরতন্ত্র থেকে মুক্তি।

স্বৈরতন্ত্র যখন টুঁটি চিপে ধরে সাধারণ মানুষের, ঠিক তখনই জনগণ এককাট্টা হয়। একটু ভুল বললাম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয়, সবসময় তা হয় না। যেমন আমাদের প্রতিবেশী লাল রাষ্ট্রে সেটা হয়নি। ১৯৮৯ নাগাদ তিয়েনানমেন স্কোয়্যারে এক জোরদার প্রতিবাদ অবশ্যই হয়েছিল। কিন্তু সেই আন্দোলন পিষে দেওয়া হয়েছিল অ্যাসল্ট রাইফেল আর ট্যাঙ্ক দিয়ে। তবুও এত কিছুর পরেও চেন গুয়ানচেঙের মতো দৃষ্টিহীন মানবাধিকার কর্মীকে রোখা যায়নি। তাঁর প্রতিবাদের সুর রাষ্ট্রের কানে পৌঁছানোমাত্র শুরু হয়েছিল কড়া নজরদারি, গৃহবন্দি করা হয়েছিল চেনকে। চেন পালিয়ে বেজিঙের ইউএস এমব্যাসিতে পৌঁছালেন। তখন সারা পৃথিবী জানল তাঁকে। চিনল তাঁর লড়াই আর কমিউনিস্ট সরকারের স্বরূপকে।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি

বেশির ভাগ শিল্প-সাহিত্য গড়ে উঠেছে জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নিয়ে। এক সাংঘাতিক পালানোর গল্প দেখা গিয়েছিল সিনেমার পরদায়। '৮১ সালের সেই ছবি সাড়া ফেলে দিয়েছিল বিশ্বে। ১৯৪২ সালে ইউক্রেনের এক ফুটবল টিম পরপর ম্যাচে হারিয়ে যাচ্ছিল জার্মান আর্মির দলকে। তারপর নিখোঁজ হয়ে যায় খেলোয়াড়রা। লোকের মুখে শোনা যেত, জীবন ছিনিয়ে মাঠের বদলা নিয়েছে জার্মানি। মৃত্যুর সঙ্গে ফুটবল খেলার সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে তৈরি হল 'এসকেপ টু ভিক্টরি'। সিলভেস্টার স্ট্যালোন, ববি মুর, পেলে অভিনীত সেই

ছবি জলপাইগুড়ির রূপশ্রী সিনেমা হলে আমরা অনেকেই দেখেছি। নাৎসি দলের সঙ্গে একটা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে একদল যুদ্ধবন্দি। তারা ঠিক করেছিল, হাফ টাইমেই চেঞ্জিং রুমের শাওয়ারের পাইপ দিয়ে পালাবে। রেফারির শয়তানিতে হাফ টাইমে ১-৪ গোলে পিছিয়ে গেল বন্দিরা। তাতেই রোখ চেপে গেল গোটা দলটার। না পালিয়ে সবাই ফিরে এল মাঠে। দুর্দান্ত খেলে ৪-৪ করল তারা। এবং পালালও। খেলা শেষের পর দর্শক যখন ঢুকে পড়েছে মাঠে, সেই সুযোগে।

সাহিত্যের থেকে ধার নেবে না। পিকাসো আর ব্রাক ছবির জগতে 'কিউবিজ্‌ম' নিয়ে এসে বিপ্লব করলেন। ছবির ইতিহাসটাই বদলে গেল।

সাধারণ লোকের অবশ্য তাতে কিছু যায়-আসে না। আইন করে সে সতীদাহ বন্ধ করতে বাধ্য, শক্ত কবিতা পড়তে তো বাধ্য নয়। তবু তার পরিচিত বিজ্ঞাপন, ঝকমকে পত্রিকার প্রচ্ছদ, টিভির হিট প্রোগ্রামের মধ্যে ঠিক ঢুকে পড়ে প্রথা-ভাঙা শিল্পের উপাদানগুলো। চালু হিন্দি সিনেমায় গোদারের সৃষ্ট জাম্প-কাট হামেশা দেখা

> ১৯৪২ সালে ইউক্রেনের এক ফুটবল টিম পরপর ম্যাচে হারিয়ে যাচ্ছিল জার্মান আর্মির দলকে। তারপর নিখোঁজ হয়ে যায় খেলোয়াড়রা। লোকের মুখে শোনা যেত, জীবন ছিনিয়ে মাঠের বদলা নিয়েছে জার্মানি। মৃত্যুর সঙ্গে ফুটবল খেলার সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে তৈরি হল 'এসকেপ টু ভিক্টরি'।

যায়। জনপ্রিয় কবির টানা গদ্যে লেখা পদ্য পড়ার ফাংশনে আবৃত্তি করে পাড়ার খুদেরা।

প্রথা থেকে মুক্তি

সামাজিক প্রথা থেকে মুক্তি সহজে পাওয়া যায় না। কারণ সেই মুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলে ওঠে নিজের ভিতর থেকেই একটা রক্ষণশীল সত্তা। তার মনে হয়, এতদিন যা হয়ে এসেছে, সেটাই হয়ে চলা প্রয়োজন। এই ফরমান সে দেয় নতুন কিছু সম্পর্কে তার অস্বস্তি থেকে। অচেনার প্রতি তার ভয় থেকে। যখন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছিল, তখন সই সংগ্রহের হিসেব ধরলে বোঝা যায়, বেশির ভাগ মানুষ চেয়েছিলেন, সতীদাহ চলুক। কেননা ওটা আমাদের একটা প্রথা। কিন্তু প্রথা বলেই কেন তা চলতে হবে, প্রথাকে প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করা যাবে না কেন— এ কথা সাধারণ মানুষের মাথায় খুব একটা সেঁধায় না। বিধবাবিবাহের পক্ষে যখন বিদ্যাসাগর আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তাঁকে কত কদর্য কুৎসা শুনতে হয়েছে, তার ঠিক নেই।

একসময় যা থাকে কট্টর প্রথা, তা ভেঙে বেরিয়ে মানুষের আবার এমন অভ্যাস হয়ে যায়, কালে কালে সেটাই হয়ে ওঠে কট্টর প্রথা। কবিতায় ছন্দ থাকবে, ছবি দেখলে কীসের ছবি আঁকা হয়েছে তা বোঝা যাবে, সিনেমায় একটা গল্প বলা হবে— এগুলো হচ্ছে শিল্পের প্রথা। কিন্তু কয়েকজনের বেপরোয়া ট্যালেন্টে ভর করে কবিতার ছন্দ ভেঙে গদ্যকবিতা চলে এল। কানদিনস্কির অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট এসে দেখাল, ছবিতে কোনও নির্দিষ্ট কিছুর আদল না থাকলেও চলে, আর জাঁ লুক গোদার এসে সিনেমার দরজা দিয়ে গল্প জিনিসটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, সিনেমা সিনেমার ভাষায় কথা বলবে,

অপবাদ থেকে মুক্তি

অপবাদ জিনিসটা পাবলিক খায় খুব। সেই অপবাদের গোড়ায় যদি লুকিয়ে থাকে কোনও রগরগে কেচ্ছা বা যৌন কেলেঙ্কারি তাহলে তো কথাই নেই। চায়ের কাপে তুফান ওঠে তখন। লোকাল ট্রেন, পাবলিক বাস, মোড়ের আড্ডা টগবগ করে ফুটতে থাকে তখন। এমনিতে জনগণ স্মৃতিভ্রংশ রোগে ভোগে। কবে কার থেকে টাকা ধার নিয়েছিল, কবে কে অনেকখানি উপকার করেছিল, সেসব লোকে তেমন মনে রাখে না। কিন্তু অপবাদের গন্ধ পেলে সেই বেভুল পাবলিক চনমনিয়ে ওঠে। কবে কোন মাস্টারের সঙ্গে এক ছাত্রীর নাম জড়িয়ে কুৎসা রটেছিল, কবে কোন ডাক্তারকে ভুল চিকিৎসায় রোগী মেরে ফেলার জন্য ভরা বাজারে ঠাঁটিয়ে চড় মেরেছিল পেশেন্ট পার্টি, কবে চিটফান্ডের ব্যবসায় ডুবে গিয়ে শেষে ট্রেন লাইনে গলা দিয়েছিল কে— এসব পাবলিক ভোলে না কখনও।

সাহিত্যে বা চলচ্চিত্রে অপবাদের শেষে পজিটিভ ঘটনার রমরমা। আলেকজান্ডার ডুমা যেমন তাঁর উপন্যাসের গোড়ায় এডমন্ড দান্তেকে দিয়েছিলেন যাবজ্জীবন সাজা, নেপোলিয়নের চর হওয়ার মিথ্যে অপবাদে। উপন্যাসের পরের অংশে সেই জেল-পালানো দান্তের হাতেই স্টিয়ারিং। পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কুচক্রীদের সাজা দেওয়ার পালা। 'চক! দে ইন্ডিয়া' ছবিতে শাহরুখ খান অভিনীত কবির খান যেমন। পাকিস্তানের কাছে হকি ম্যাচে হেরে তাঁর গায়ে লেগেছিল পাঁক। এই ঘটনার সাত বছর পর একটা ধুঁকতে থাকা মেয়েদের জাতীয় হকি টিমের কোচ হয়ে সেই টিমটাকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করে নিজের কপালে সেঁটে দেওয়া 'বিশ্বাসঘাতক' স্টিকারটা তুলে ফেললেন তিনি। মুক্ত হলে মিররঞ্জন নেগিও। ছবিটি যাঁর জীবন থেকে ধার করে বানানো হয়েছিল।

সব অপবাদই কি মিলিয়ে যায়? উঁহু, যায় না। বাস্তবের পথে গোলাপের পাপড়ি বিছিয়ে রাখেনি কেউ। মাথায় ঘোল নিয়ে গাধার পিঠে চেপে গ্রামছাড়া হবার পরেও রাজার জামাই হয়ে প্রত্যাবর্তন করার মতো 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' মার্কা ভাগ্য থাকে না সকলের। মিথ্যে অভিযোগে অভিযুক্তদের পিঠে সহানুভূতির হাত পড়ে না বেশির ভাগ সময়। সে কারণেই 'ডাইনি' হওয়ার দায় অনায়াসে চাপানো যায় গাঁ-গঞ্জের মহিলাদের উপর। হাজার সরকারি প্রচার সত্ত্বেও আজও এইডস-মুক্ত হতে পারেনি ছোঁয়াচে রোগের তকমা থেকে। অসংখ্য এইডস রোগীও ছাড়া পান না আমাদের সমাজে একঘরে হওয়ার হাত থেকে।

সংসার থেকে মুক্তি

রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের সেই তারাপদকে মনে আছে? সে নিজের ইচ্ছেতে সব কাজ করে। কিন্তু এমন সহজে করে যে কোনও জেদ নেই, গোঁ নেই, লজ্জাও না। গাঙে পালতোলা নৌকো দেখলে, গাছের ছায়ায় তীর্থ-ফেরত সন্ন্যাসী দেখলে, হাটেগঞ্জে বেদে-বেদেনি দেখলে সে শুনত বেরিয়ে পড়ার ডাক। বাবা-মায়ের মতো মতিলাল-অন্নপূর্ণার স্নেহ, চারুশশীর কচি মুখের মায়া, কড়ি-গোনা জীবন তাকে বাঁধতে পারে না। সে নির্দায়, তাই নির্দয়ও। পিছুটানহীন হয়ে স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধনকে 'গুডবাই' করে সে উদাসীন অতিথির মতো পথে বেরিয়ে পড়ে বারবার। সে সাধ্য, এমনকি সাধও সকলের নেই। নিরানব্বই শতাংশ জনগণের তাই বন্ধনেই মুক্তি।

সংসারবাঁধনের তো অভাব নেই। পাহাড়-সমুদ্র-জঙ্গলের মাধুর্যে বুঁদ হয়ে, কিশোরী আমনকারের একটা মিড় শুনে, মেসির রামধনুর মতো বাঁকানো ফ্রি-কিক দেখে, এক থালা সাদা শিউলি ফুলের মতো অন্নের ঘ্রাণ নিয়ে কিংবা সদ্যোজাত কোনও শিশুকে স্পর্শ করার মধ্যে লুকিয়ে আছে যে অতুল পুলক— তার তুলনা কোথায়। তখন মনে হয়, এ-ই হল ঋত-পথ। মনে মনে রবার্ট ব্রাউনিং-এর হিরোর মতো উচ্চারণ করতে ইচ্ছে করে— হু নোজ বাট দ্য ওয়ার্ল্ড মে এন্ড টুনাইট?

মণীষীদের স্মৃতিধন্য শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন অবহেলায় ঘিরেছে আগাছার জঙ্গল আর জবরদখল

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকার সময় অবহেলিত শিলিগুড়ি টাউন রেল স্টেশনকে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে এই স্টেশনের জন্য কিছুই করা হয়নি।

ইতিহাসের খবর হল, শিলিগুড়ির টাউন রেল স্টেশন তৈরি হয় ১৮৭৮ সালের পর। শিলিগুড়ির সঙ্গে তখন দার্জিলিং পাহাড়ের ১৯ মাইল পথ রেল দ্বারা যুক্ত হয়েছিল। ১৮৮১ সালের পর যখন কলকাতার সঙ্গে দার্জিলিঙের রেল যোগাযোগ পুরোপুরি চালু হল তখন থেকে সেই শতাব্দির শেষ ভাগ পর্যন্ত ভারত বিখ্যাত ও ভারতের বাইরের স্বনামধন্য মানুষ এই শিলিগুড়ির রেল স্টেশনে কিছু সময় কাটিয় টয় ট্রেনে দার্জিলিং পাহাড়ে গিয়েছেন। কোচবিহারের মহারাজা, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আসেন এই স্টেশনে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হাত ধরে আসেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে কবি আবার একা আসেন। আমেরিকার সাহিত্যিক মার্ক তয়েন, হাঙ্গেরির গবেষক কসমা ডি কোরস, স্বামী বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস শিলিগুড়ির এই স্টেশন দিয়েই দার্জিলিং গিয়েছেন। স্বর্ণলতা দেবী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামী নিরভয়ানন্দ, সাহিত্যিক জলধর সেন, দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী, যতীন্দ্র ভূষণ আচার্য, সাংবাদিক লেখক গোপাল নারায়ণ মজুমদার, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ এই স্টেশন দিয়েই দার্জিলিং গিয়েছেন। তারা এখানে বিশ্রামও নিয়েছেন। বিপ্লবী বাঘাযতীনের সঙ্গে ইংরেজ সৈনিকদের যে বিবাদের কথা প্রচলিত আছে তা এই স্টেশন ঘিরেই। ১৯০৬ সালে বাঘাযতীন দার্জিলিঙে কর্মরত ছিলেন। কলকাতা থেকে দার্জিলিং যাওয়ার সময় ওই স্টেশনে বসে থাকার সময় একবার বাঘাযতীন দেখেন, এক ইংরেজ এক মহিলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন। তা দেখে সেই সাহেবকে ঘুষি মারেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও কয়েকবার এই স্টেশনের ওপর দিয়েই কার্সিয়াং যান। এইরকম দেশপ্রেমিকদের স্মৃতিধন্য শিলিগুড়ির টাউন স্টেশনকে রেল মন্ত্রী থাকার সময় হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপর আর উন্নতি হয়নি। মণীষীদের স্মৃতিধন্য প্ল্যাটফর্মে আজ ভবঘুরেদের আনাগোনা। স্টেশনে কুকুর, ছাগল, শুকর ঘুরে বেড়ায়। স্টেশনের পাশেই জঙ্গল। দিনের পর দিন তা পরিষ্কার হয় না, তা থেকে বের হয় সাপ। পুরনো স্টেশনের সব ঘর দিয়েই জল পড়ে। আরপিএফ-এর কর্মীরা বেশি বৃষ্টি হলে প্লাটফর্মে চেয়ার পেতে কাজ করেন। দিনরাত সবসময় বসছে মদ গাঁজার আসর। অশ্লীল সব কাজও চলতে থাকে। ঐতিহ্য মন্ডিত স্টেশনের গায়ে নতুন রূপে স্টেশন সম্প্রসারণ হলেও হেরিটেজ বিল্ডিঙের কোনও সংস্কার হয়নি। স্টেশনের চারপাশে রেলের জমি দিনের পর দিন দখল করে যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। আর সেখানেই বসছে বাজার। স্টেশন দিয়ে বহুদিন ধরে চলে না টয় ট্রেন। এখন সেখানে হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার, আলিপুরদুয়ার ও বামনহাট প্যাসেঞ্জার দিনে দুবার দাঁড়ায়। আর সারা দিনে তার ওপর দিয়ে যাতায়াত করে ৩০টি ট্রেন। প্রতিদিন সেখানে ৫০০ জন যাত্রী ওঠানামা করেন। এনএফ রেল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক তনুজ দে বলেন, তারা চাইছেন এই স্টেশনের অবস্থার উন্নতি হোক। স্টেশনের সামনে ফুলের বাগান তৈরি করে দেশের গান আর মণিষীদের ছবি টাঙানো যেতে পারে। রেলের পদস্থ আধিকারিক পার্থ শীল বলেন, তারা বেশ হতাশ ওই স্টেশন নিয়ে। স্টেশনের চারপাশে জবরদখল করে বস্তি, বাজার হচ্ছে। সেসব তুলে সৌন্দর্য বাড়ানো যায়। কিন্তু জবরদখল তোলা যাচ্ছে না। রেল সেখানে কাজ করতে চায়। কিন্তু বাধা পাচ্ছে। আর দিনের পর দিন নানান বাধা চলতে থাকায় ওই স্টেশনের জন্য আসা রেল দফতরের প্রায় এক কোটি টাকা ফেরত চলে গিয়েছে। সেখানকার এক আরপিএফ কর্মী বলেন, তারা এখন কোনও মত দেখে রাখছেন। তারা না থাকলে স্টেশনটিই ধীরে ধীরে দখল হয়ে যাবে।

বাপি ঘোষ

পর্যটনের ডুয়ার্স

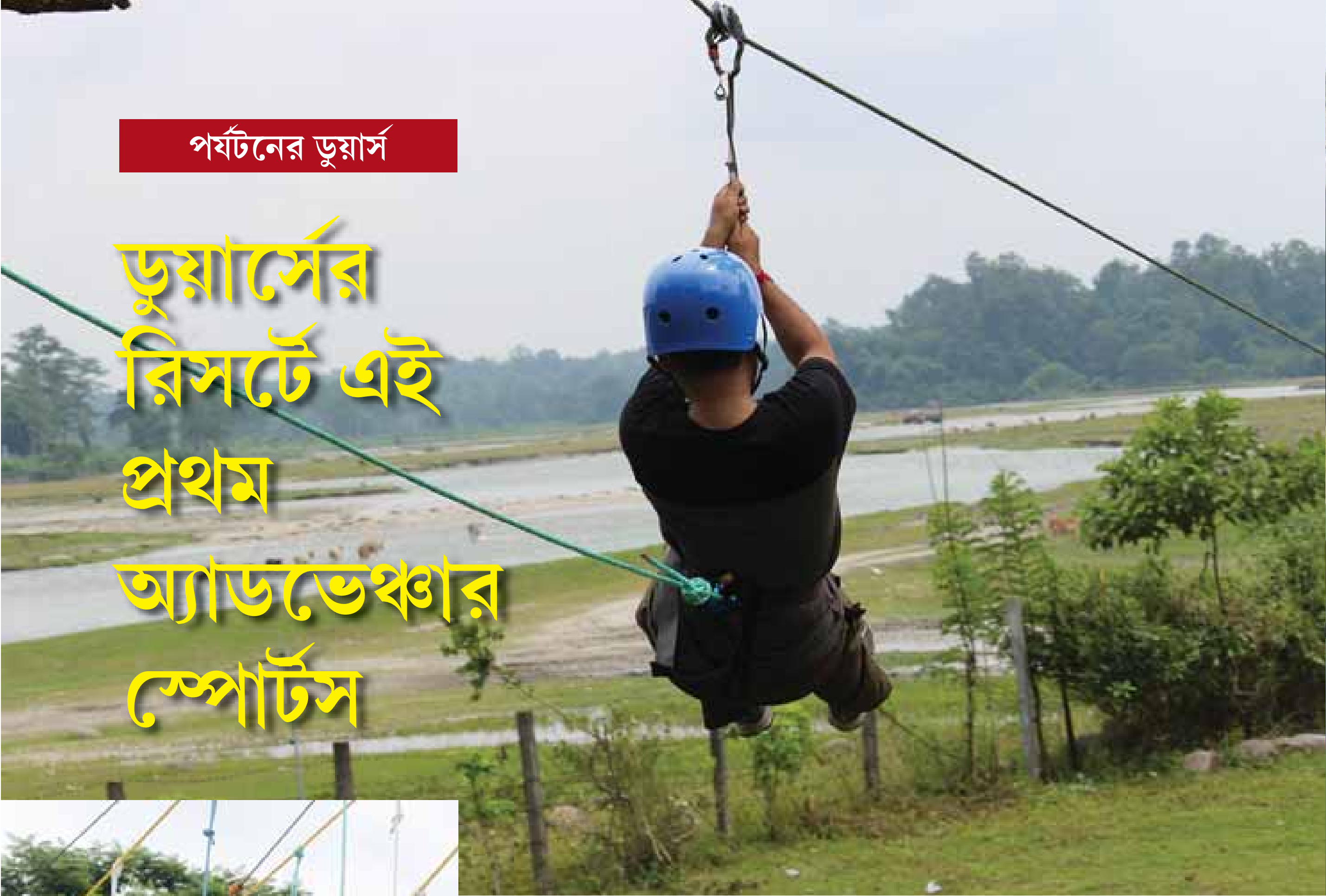

ডুয়ার্সের রিসর্টে এই প্রথম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস

একেবারে নতুন সাজে সেজে উঠেছে গরুমারার জঙ্গলের একপ্রান্তে মূর্তি নদীর ধারের বহুদিনের পরিচিত ইকো রিসর্টটি। আর এবার নতুন সংযোজন পর্যটকদের জন্য অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রথম পাঠ। যার মধ্যে রয়েছে বার্মা ব্রিজ, রিগর‍্যাগ, সিলিন্ডার ওয়াক, বসুন চেয়ার, কম্যান্ডো ওয়াক এবং সর্বোপরি জিপ লাইন। রিসর্টের অন্যতম কর্ণধার তাপস বরণ চন্দের ব্যাখ্যা, ডুয়ার্সে সপরিবারে বেড়াতে এলে সকাল-বিকেল কয়েক ঘণ্টার জন্য জঙ্গল সাফারি ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার থাকে না। সাইট সিইং বলতে যা বোঝায় ডুয়ার্সে এখনও তার প্যাকেজিং নেই বা পরিকাঠামো গড়ে ওঠে নি। সেখানে প্রকৃতি উপভোগের সঙ্গে যদি কিঞ্চিৎ অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ মেলে তবে নিঃসন্দেহে পর্যটক আকর্ষণ বাড়বে বইকি। শহরের গতে বাঁধা জীবন শরীর চর্চার কোনও সুযোগই থাকে না, স্কুলেও বাচ্চারা আজকাল খেলাধূলার সুযোগ পায় কতটুকু? শরীরের ফিটনেস কতটা বেঁচে আছে, টুরিস্টরা এসে অন্তত সেটা পরখ করে দেখতে পারবেন। আর ছোটরা পেতে পারে অভাবনীয় আনন্দের সন্ধান। তাপসবাবু আক্ষেপ করলেন, পাহাড়ের কথা না ছেড়েই দিন, তাঁবু-টাবু করে রিসর্ট এর আগে অনেক হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত অ্যাডভেঞ্চারের পাঠ নেওয়ার স্থায়ী ব্যবস্থার কথা কেউই কখনও ভাবেনি। তার কারণও অবশ্য বললেন তিনি, আসলে এখনও পর্যন্ত পরিকাঠামোগতভাবে ডুয়ার্স পিছিয়ে থাকায়, উৎসাহী উদ্যোগপতি থাকলেও তাঁরা বছরভর পর্যটক আনাগোনার গ্যারান্টি পান না। তাপসবাবুর মতে, কলকাতার বহু প্রকৃতিপ্রেমীর খেয়ালে গরুমারা-জলদাপাড়ার আশপাশে গড়ে ওঠা কটেজের সংখ্যা, আইনি ও বেআইনি, নেহাত কম নয়। অথচ তাদের মাথায় কখনই আসেনি জঙ্গল ছাড়া পর্যটকদের আর কী কী দেওয়া যেতে পারে। তাই স্বল্প ক্ষমতা ও পরিসরে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস শুরু করতে পেরেছেন বলেই উচ্ছ্বসিত তাপসবাবুরা।

রিসর্টে না থাকলেও চলবে, ডে ভিজিটররা টিকিট কেটে এইসব স্পোর্টসে যোগ দিতে পারবেন। ভয়ের কোনও কারণ নেই, সব সময়ের জন্য রয়েছেন দক্ষ প্রশিক্ষকরা, তবে রিসর্টের অবস্থান, গুণমান

দেখলে যে কারোরই ইচ্ছে করবে দুটো দিন এখানেই কাটাতে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ১৫ অগস্ট, ২০১৭। বুকিং ইত্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন ৯৯০৩৮৩২১২৩, ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬ নম্বরে। ট্রাভেল এজেন্ট বন্ধুরাও এগিয়ে আসুন, ডুয়ার্সের এই অভিনব উদ্যোগকে সফল করার জন্য, উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সাদর আহ্বান জানালেন তাপসবাবু।

নিজস্ব প্রতিবেদন

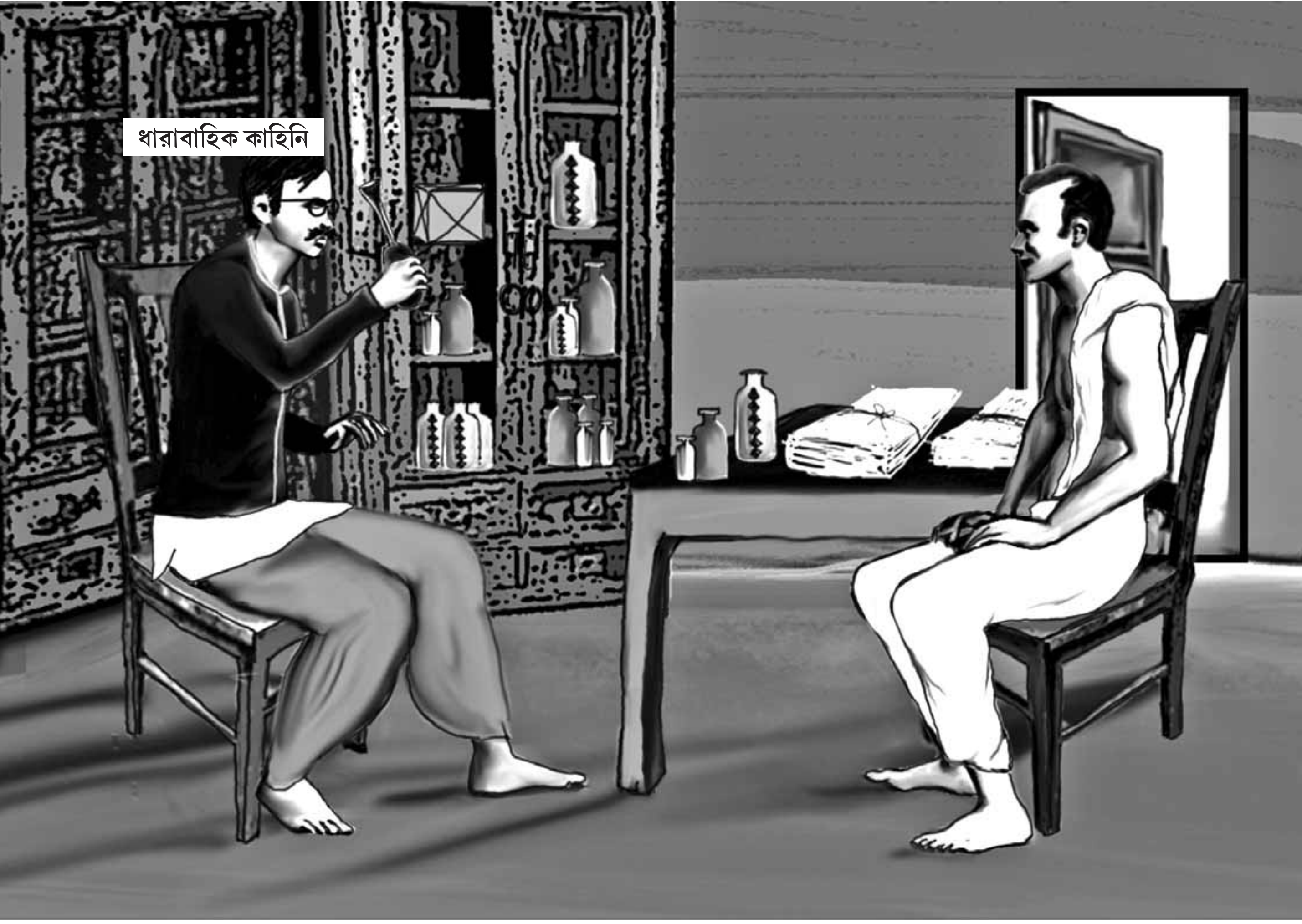

৫৩

উৎরাই তরাই

জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল হওয়াটা যে টাউনের পক্ষে শনিবিশেষ, সেটা চক্কোতি লগ্ন বিচার করে আগেই বলে রেখেছিলেন। নিখিল ডাক্তার সেটা বিলক্ষণ বিশ্বাস করছেন। এখনও তাঁর পসারে টান পড়া শুরু হয়নি, কিন্তু শনি যে আশপাশেই ঘুরঘুর করছেন— তা টের পাওয়া যাচ্ছে। আজ সকাল সকাল চেম্বার খুলে বসার পর মোট এগারোজন এসেছে বিজয়ার প্রণাম করার জন্য, রোগী একটাও না। অবশ্য সকাল সকাল চেম্বারে তিনি খুবই কম বসেন। এই পুজোর ক'টা দিন। তাই হয়ত রোগী আসেনি। এগারো নম্বর বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করার পর চেম্বার ফাঁকা হতে নিখিল ডাক্তার পাশে রাখা হুঁকোটা তুলে ফুঁ দিয়ে আগুনটা উসকে দিয়ে কয়েকটা টান মেরে বললেন, 'এক অবনীতে রক্ষে নেই, জ্যাকসন এল দোসর! ননি মুস্তাফিকে পারল বাঁচাতে? খুব নাকি সিবিল সার্জেন তিনি?'

চক্কোতি আমোদ পেয়ে খ্যা খ্যা করে হেসে বললেন, 'শালারা মাগির বুকে নল বসাতে ওস্তাদ!'

'যা বলেছেন!' সমর্থন জানান নিখিল ডাক্তার, 'নাড়ি থাকতে স্টেথোর কী দরকার? হাত থাকতে বুক কেন বাপু?'

'দেশের বেস্পতির কপালে গ্রহণ লেগেছে, বুঝলে?' চক্কোতি চারদিক তাকিয়ে গলাটা একটু নামালেন, 'কাল গদাইবাবুর কাছে যা শুনলাম, তাতে তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছি!'

'বুকে নল বসানোর ব্যাপারে?'

'আরে না মশাই! তার চাইতেও সাংঘাতিক!' চক্কোতি একটু ঝুঁকলেন। মুখটা নিখিল ডাক্তারের মুখের এক ফুট ব্যবধানে এনে ফিসফিস করে বললেন, 'যত খুশি সংগম করুন মশাই— গভ্‌ভো হবে না!'

'আরে, সে তো বেবুশ্যেরা মাগিগুলোও জানে। তবে সবসময় কাজ দেয় না। গভ্‌ভো হয় যায়। আমার ছোট মেয়েটা তো ওভাবেই হল। গভ্‌ভো মশাই কখন হয়ে যায়, ভগবানও জানে না!'

'এখানে একদম গ্যারান্টি। সাহেবদের আবিষ্কার।' চক্কোতি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানালেন, 'ওদের মেয়েরা নাকি বিয়ে করেই বাচ্চা চাইছে না— তাই দরকার পড়েছে। এর মধ্যেই নাকি বাজারে চলে আসবে।'

'ছ্যা!' নিখিল ডাক্তার মুখ বিকৃত করলেন, 'বিয়ের পর বাচ্চা হবে না তো কি ঘোড়ার ডিম

হবে? আরে, বাড়ির বউ বিয়ের কয়েক বছর পর্যন্ত পেট ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তবেই না সংসার! এসব পাপ, বুঝলেন তো?'

আলোচনায় ছেদ পড়ল। বারো নম্বর বিজয়ার প্রণাম উপস্থিত। বাঁশ ব্যবসায়ী পবন মণ্ডল। নিখিল ডাক্তারের মনে হল যে, পবন অনেকদিন পর এলো। সম্ভবত শেষবার এসেছিল গত বিজয়ায়। তাই ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আজকাল তো দেখিই না! বাড়ির সবাই ভাল আছে তা-ই না? রোগব্যাধি কাছে ঘেঁষছে না? অমৃত খাচ্ছিস নাকি?'

পবন মণ্ডল তাড়াতাড়ি প্রণাম করে বলল, 'তেমন কিছু হয়নি— ছোট কাকা একটু ভুগছেন মাত্র।'

'কী হয়েছে?'

'দেহে বল পাচ্ছিলেন না। তা হাসপাতালের ডাক্তার দেখে বললেন, তেমন কিছু নয়। ওভালটিন খেতে পরামর্শ দিলেন। তা খাচ্ছেন মাসে এক টিন করে।'

নিখিল ডাক্তার মুখমণ্ডলে অমাবস্যা এনে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাইয়ে ফেলেছিস ওভালটিন? মাসে এক টিন করে?'

'অনুচিত হয়েছে বলছেন?' মুখে উদ্‌বেগ ফুটিয়ে বলে পবন মণ্ডল, 'খেতে কিন্তু বেশ!'

'তোমায় কে বলেছে যে বিষের স্বাদ খারাপ? ওভালটিন যে আসলে টিনের গুঁড়ো থেকে তৈরি, সেটা জানো?'

'টিন? মানে ঘর ছায় যা দিয়ে?' পবন বিস্মিত হয়। সে জিনিস গুঁড়ো করে খাওয়া যায় কীভাবে এবং তার স্বাদটাও বা এত ভাল হয় কেন, সেটা বুঝতে না পেরে বিস্ময়ের মাত্রাটা বেড়ে যায়।

'আসল ব্যাপারটা বুঝলেন তো?' চক্কোতি বলেন এবার, 'বাঁশের দাম ভাল যাচ্ছে। হাতে দুটো পয়সা হয়েছে। ওভালটিন কিনে খরচ করছে। বাতসারের গুঁড়ো মধু দিয়ে মেড়ে এক ফোঁটা গোমূত্র মিশিয়ে আধা চামচে খেলে যে এক টিন ওভালটিন ফেল মেরে যায়, সে কি আর এরা বুঝবে? এ জন্যই বলেছিলাম যে, জ্যাকসন স্কুল হয়ে জলপাইগুড়ির ভাগ্যে গ্রহণ লেগেছে। পাগলের কখনও মাথা ধরে শুনেছ?'

জব্বর প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে পবন মণ্ডল বলে, 'না তো!'

'মাথা ধরার বড়ি খেলে ব্যথা কমে কেন বল তো? পাগল হয়ে যায়!'

আলোচনা আবার বাধাপ্রাপ্ত হল। তবে এবার কারণটা বিজয়ার প্রণাম নয়। দু'টি যুবক সামনের ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে যাচ্ছিল। তাদের দেখে মাথা ধরার বড়ি ছেড়ে চক্কোতি ডান দিকের যুবকটিকে দেখিয়ে নিখিল ডাক্তারকে বললেন, 'ওইটিই হল খুদিবাবুর জামাই!'

'তা-ই নাকি?' নিখিল ডাক্তার উৎসাহিত হলেন, 'এবার মনে পড়ছে। আগেও দেখেছি।'

'এদের তো আবার আরেক গল্প।' চক্কোতি নাক চুলকে রহস্য করে বললেন কথাটা, 'ইনি আবার জামালদয়ে বউ নিয়ে গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়ান। পরপুরুষের সামনে বউকে দিয়ে রবিবাবুর গান গাওয়ান।'

'জামালদহে বুঝি বাড়ি? তা সেখানে লোকে কিছু বলে না?'

'বিরাট বড়লোকের ছেলে। বড় ব্যবসায়ী। তাই প্রকাশ্যে কিছু বলে না। তা বাড়বাড়ন্ত সহ্যেরও তো একটা সীমা থাকবে।'

পবন মণ্ডল ফস করে বলে দিল, 'গগনবাবু লোক কিন্তু চমৎকার! আমি বাঁশের ব্যাপারে জামালদয় যাই তো! সেখানে তাঁর দারুণ খাতির। তবে ওঁদের বাড়ি হল গিয়ে মাথাভাঙা। কালই গিয়েছিলেন আমাদের বাঁশহাটির দিকে।'

'বাঁশের ব্যবসায় নামছে নাকি?'

'তা কেন!' নিখিল ডাক্তারের তাচ্ছিল্যকর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলল পবন, 'কোজাগরীর পর রাতের বেলা তিস্তায় বেড়াবেন। তাই মাঝির খোঁজে গিয়েছিলেন। আমরা সবাই ওঁকে হদু মিঞার কথা বললাম।'

সেই মুহূর্তে গগনেন্দ্র আর বীরেন সত্যিই মাঝির সন্ধানে যাচ্ছিল। হদু মিঞাকে পাওয়া যাবে না। সে বুক্‌ড। দু'জন সাহেব তাকে নিয়ে পূর্ণিমার রাতে বার হবেন। তিন-চার দিন নাকি কাটাবেন নদীতে। তবে সে আরেকজন মাঝির সন্ধান দিয়েছে। এ পাড়ার শেষে কয়েক ঘর গরিব মুসলিম আছে। সেখানে গিয়ে সোলু শেখকে খুঁজতে হবে। কাল কোজাগরী। হাতে আর একদম সময় নেই। আশ্বিন মাস হলেও তিস্তায় দু'দিন ধরে বেশ জল। পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে নির্ঘাত। জল বাড়লে তিস্তার ছোট ঘূর্ণিগুলো বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। নদী মূলত পুব পাড় ঘেঁষে বইছে, কয়েক বছর হল। জল সেদিকে বেশি থাকে। পাকা মাঝি না হলে নৌকো সামলে ঠিকমতো নিয়ে যেতে পারবে না। বীরেন আর গগন ঠিক করেছে যে, তারা গোপাল ঘোষের কাছে শেষ মুহূর্তে বজরাটার জন্য আবেদন জানাবে। তবে সেখানে একটু সমস্যা থাকবে। জল কমতে শুরু করলে চলতে পারবে না সে বজরা।

পবন মণ্ডলের কথা শুনে চক্কোত্তি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'টাকা থাকলেই যে বউ নিয়ে কেচ্ছা করতে হবে, তার তো কোনও মানে নেই। তা তিনি রাতের বেলা তিস্তায় ঘুরবেন কেন?'

'আজ্ঞে, বড় মানুষদের শখ। বয়স তো

> 'মুনিঋষিদের মতো দাড়ি নিয়ে রবিবাবু যদি মেয়েদের স্টেজে নাচাতে পারেন, তবে ওদের দোষের কিছু নেই। আসলে দিনকাল আর আগের মতো নেই। ধম্ম বলো, দেবতা বলো— সবই হল সাদা চামড়া।

বেশি নয়।'

'বয়সটাই তো বলে দিচ্ছে, নৌকোয় রাতের বেলা কী হবে!' ফাজিলের মতো হেসে উঠলেন চক্কোত্তি, 'চাঁদের আলোয় ছইয়ের নিচে মাগির বুকে নল বসাবে!' বলে আরও জোরে, শরীর ঝাঁকিয়ে হাসতে শুরু করলেন তিনি। হাসির দমকে কাশি চলে এল। সেসব সামলে ধুঁতির খুঁট তুলে মুখ মুছে শান্ত হলেন অবশেষে। নিখিল ডাক্তার খুশিতে ডগমগ হয়ে হুঁকোর ধোঁয়ায় ঘরটা ভরিয়ে ফেললেন।

'তা ওদের আর দোষ কী?' নিখিল ডাক্তার হুঁকো রেখে বললেন, 'মুনিঋষিদের মতো দাড়ি নিয়ে রবিবাবু যদি মেয়েদের স্টেজে নাচাতে পারেন, তবে ওদের দোষের কিছু নেই। আসলে দিনকাল আর আগের মতো নেই। ধম্ম বলো, দেবতা বলো— সবই হল সাদা চামড়া। সে দিন আবার শুনলাম, পাশের বাড়ির গণেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস! সেটা নাকি কবিতা! কবি নাকি মুসলিম! আরে, কুলীন কায়স্থের ছেলে মুসলিমের লেখা বই পড়ছিস, গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছিস তো?'

'বুঝেছি। নজরুল ইসলাম।' চক্কোত্তি হতাশার সুরে জানালেন, 'নিচু জাতদের নিয়ে মোহন গান্ধির বাড়াবাড়িটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে, বুঝলে? টাউনে লিগের বাড়বাড়ন্তটা চোখে পড়ছে নিশ্চয়ই?'

দু'জন আবার মত্ত হয়ে পড়ল মুসলিম লিগের কাজকর্মের ব্যাখ্যায়। পবন মণ্ডল আর দাঁড়াল না। নীরবে বেরিয়ে এল নিখিল ডাক্তারের চেম্বার থেকে। ছেলের বগলের ফোড়াটা যে অস্ত্র করে সারিয়ে ফেলা গিয়েছে, সেই সংবাদটা এ যাত্রায় জানাল না সে। আর ওভালটিনে মোটেই টিন নেই। ওটা বাজে কথা। কোর্টের সব চাইতে বড় জজ ওভালটিন খায়— এটা সে বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছে।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

মশলা ভিন্ডি

উপকরণ: কচি ভিন্ডি বা ঢেড়স ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১টা বড় কুচিয়ে কাটা, কাঁচা লঙ্কা— স্বাদ অনুসারে, গন্ধরাজ লেবু ১ টুকরো, হলুদ সামান্য, জিরে গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো স্বাদ অনুসারে, লবণ ও মিষ্টি— স্বাদ অনুসারে, সরষের তেল— বড় চামচের ২ চামচ।

প্রণালী: প্রথমে ভিন্ডিগুলো ভাল করে জলে ধুয়ে ২-৩ টুকরো করে কেটে নিন ও লবণ হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কড়াইতে সরষের তেল দিন ও গরম হলে তাতে মেথি ফোরণ দিন ও মেথি কালো রং হলে তেল থেকে তুলে ফেলে দিন। এবার ওই তেলে পেঁয়াজ কুচি দিন। বাদামী রং না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থাকুন। তারপর ভিন্ডির টুকরোগুলো কড়াইতে দিয়ে দিন। একটু নাড়াচাড়া করে একে একে হলুদ, জিরে, ধনে, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিন সঙ্গে লঙ্কা টুকরো করে কেটে ওর মধ্যে দিয়ে দিন। ভাল করে নাড়াচারা করে লবণ ও মিষ্টি দিয়ে গ্যাস কম করে ঢাকা দিয়ে রাখুন। ৫-৬ মিনিট এভাবে রাখার পর ঢাকনা খুলে গন্ধরাজ লেবুর রসটা দিয়ে দিন, আবার ঢাকা দেবেন। মনে রাখবেন একটুও জল দেবেন না। ২-৩ মিনিট পর গ্যাস বন্ধ করে দিন। মশলা ভিন্ডি তৈরি। সাদা ভাত বা পরটা রুটি সবার সঙ্গে এই পদটি খুব ভাল লাগবে।

শ্রাবণী চক্রবর্তী

ঈশ্বরের আপন দেশ কেরালায়

গত পুজোর ছুটিতে আমরা ন'জন স্কুল শিক্ষিকা মিলে বেরিয়ে পড়েছিলাম কেরালা টুরে। বাড়ির লোকেদের কারও সময় নেই, সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত! নিজেদের মতো করেই টুর প্ল্যান করে নিয়েছিলাম। নিউ কোচবিহার থেকে পাক্কা তিন দিনের ট্রেন যাত্রা। আমাদের সবারই একমত গোড়া থেকেই, বেড়াতে যাব যখন, তখন আরাম করে থাকব, খাব, বেড়াব। টিকিট ছিল এসি

হাউসবোট, আলেপ্পি

পেরিয়ার লেক

থ্রি-টিয়ারের। সবাই বাড়ি থেকে এত এত খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনটে দিন ট্রেনের মধ্যে কোন দিক দিয়ে কেটে গিয়েছিল, বুঝতেই পারিনি। বেড়ানোর আনন্দ তিন ভাগের এক ভাগ যেন ট্রেনেই মজুত ছিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় নামলাম কোচিন। স্টেশনে গাড়ি অপেক্ষাই করছিল।

মুন্নার

সোজা হোটেলের যে যার ঘরে ঢুকেই লম্বা স্নান। তারপর সবাই নেমে এলাম লবিতে। আড্ডা চলল অনেক রাত অবধি। পরদিন সকাল সকাল উঠে গাড়িতে চেপে কোচিন দেখতে বেরলাম। ইহুদি ও ওলন্দাজদের স্মারক রয়ে গিয়েছে শহর জুড়ে। এ শহরের ল্যান্ডস্কেপ একেবারেই অন্যরকম। গোয়া বা পুদুচেরির থেকে আলাদা। বিকেলে গেলাম কোচিন হারবার। সবাই মিলে উপভোগ করলাম হারবার ক্রুজ।

পঞ্চম দিন সকালে হোটেল ত্যাগ। ব্যাগপত্র গাড়িতে। ঘণ্টা চারেকের সুহানা সফর। কেরালার প্রাকৃতিক রূপ দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, সত্যিই যেন ঈশ্বরের আপন দেশে পৌঁছে গিয়েছি। মুনারে পৌঁছে গেলাম লাঞ্চ টাইমে, যার গল্প শুনে আসছি ছোটবেলা থেকে, যার ছবি দেখে দেখে আশ মেটেনি। চা-বাগানের রূপকথা বলতে যা বোঝায়, মুনার তা-ই। পরদিন পুরোটা কেটে গেল মুনারের আনাচকানাচে ঘুরে ঘুরে। সপ্তম দিন মুনার থেকে থেক্কাডি, ফের ঘণ্টা চারেকের পথ। দিনভর পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভ, স্পাইস গার্ডেন ইত্যাদির পালা। কেরালা যত ঘুরছি, তত বেশি যেন ভাল লাগছে। তারপর দিন লম্বা সফরে আলেপ্পি। ব্যাকওয়াটার ক্রুজ, হাউসবোটে রাত্রিবাস— পুরোটাই যেন স্বপ্নের মতো। বুড়ো বয়সে নিজেদের দুষ্টুমির গল্প না-ই বা বললাম।

তারপরের দৃশ্যে ত্রিবান্দ্রম শহর এবং অতঃপর কোভালাম সৈকত, সৌন্দর্যে যাকে দুনিয়ার অন্যতম সেরা মানা হয়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দশ দিন কোথা দিয়ে চলে গেল, কেউ টের পাইনি। ফোন আসছে দিনে দু'-একবার। ব্যাস, ওইটুকুই। আমরা সবাই বুঁদ হয়ে আছি কেরালায়। শেষ একরাত কাটিয়ে এলাম কন্যাকুমারী। ভারত ভূখণ্ডের শেষ প্রান্তে পৌঁছে অন্যরকম অনুভূতি হয়, বলাই বাহুল্য।

ফেরার ট্রেন ছিল পরদিন ত্রিবান্দ্রম থেকে বিকেলে। ফের সেই লম্বা পথ। পুরোটা এলাম ঘুমাতে ঘুমাতে। এক বছর হতে চলল, এখনও ওই ক'দিনের ছবি দেখি স্বপ্নে। এক অচেনা মুক্তির আনন্দ পেয়েছিলাম ওই ক'টি দিন সবাই। ও হ্যাঁ, বলা হয়নি, কেরালা যদিও অত্যন্ত ভব্য ও নিরাপদ রাজ্য, তবুও আমাদের সঙ্গে ছিলেন একজন গাইড। আর এসব আয়োজন করে দিয়েছিল শ্রীমতী ডুয়ার্সের এক শ্রীমতী, ব্রততী। পেশায় টুর অপারেটর, ওর ফোন নম্বর আপনাদেরও কাজে লাগতে পারে— ৯০০২৭৭২৯২৮।

প্রতিমা পাল

সাজসজ্জার দেশজ কারুশিল্প ও 'শ্রীমতী ডুয়ার্স স্বনির্ভরা'

ডুয়ার্সের সংস্কৃতি ও শিল্পকে ইকো পর্যটনের অপরিহার্য অঙ্গ করে তোলবার উদ্যোগ নিয়ে 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে একটি স্বীকৃত অলাভজনক সংস্থা নেটিভ ইকো সাসটেইনেবল টুরিজম সোসাইটি। জলপাইগুড়ির 'আড্ডাঘর' তার প্রথম প্রকল্প। সেই প্রকল্পের অধীনে এবার ডুয়ার্সের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি হাতের কাজকে শোকেস করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ১৪-১৫ অগাস্ট স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতের কাজ জানা মেয়েদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করছেন কলকাতার 'শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব'-এর সদস্যা সুদত্তা বসু রায়চৌধুরী। সেইসব হস্তশিল্পের নমুনা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শিত হবে আগামী ২৫-২৭ অগাস্ট 'আড্ডাঘর' হলে আয়োজিত প্রদর্শনীতে। বলাই বাহুল্য, ডুয়ার্সের শ্রীমতীদের হাতের অনবদ্য সব কারুকাজ নানাভাবে কপি হয়ে গিয়ে শোভা পায় মহানগরীর দামি শোরুমে অথচ শ্রীমতীরা তার ন্যায্য বিনিময়মূল্য বা কদর পান না। এই সোসাইটির উদ্দেশ্যই হল প্রথমে জলপাইগুড়িতে, তারপর কলকাতায় ডুয়ার্সের অকৃত্রিম হাতের কাজকে স্থায়ী শোকেস করার। ইকো পর্যটনের আন্তর্জাতিক বর্ষে এটিই সোসাইটির প্রথম কর্মসূচি এবং তার জন্য দেশের স্বাধীনতা দিবসের লগ্নকেই বেছে নেওয়া হয়েছে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

জার্নি ডেট: ০৬/১০ ও ২৭/১২/২০১৭
(১৫ দিনের টুর, এনজেপি থেকে এনজেপি)

২১,৬০০ টাকা জনপ্রতি (প্রাপ্তবয়স্ক)
১৮,৮০০ টাকা জনপ্রতি (তৃতীয় ব্যক্তি)
১৬,৮০০ টাকা (৫-১১ বছর বয়সী)
৯,৬০০ টাকা (২-৪ বছর বয়সী)

টুর প্যাকেজে থাকছে
১) আপ ও ডাউন স্লিপার ক্লাসের ভাড়া
২) ডিলাক্স বাস বা টেম্পো ট্রাভেলার
৩) ফ্যামিলি প্রতি রুম
৪) সব খাবার (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ইভনিং টি, ডিনার) **(ট্রেনের খাবার বাদে)**

বেড়াতে চলুন ছোট্ট ছুটিতে

২ রাত ৩ দিনের প্যাকেজ টুর
(শিলিগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি)

ওল্ড সিল্ক রুট	: ৪৫০০ টাকা
পেলিং	: ৫৫০০ টাকা
লোলেগাঁও রিশপ	: ৪৫০০ টাকা
গ্যাংটক সঙ্গে ছাঙ্গু	: ৫৫০০ টাকা
ডুয়ার্স	: ৪১০০ টাকা
দার্জিলিং	: ৪৯০০ টাকা

(খরচ জনপ্রতি)

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
খাওয়া, থাকা, সাইট সিইং

দ্রষ্টব্য: প্রতি প্যাকেজে অন্তত ৮ জন হতে হবে

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office:
Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101
Ph: 03561-222117, 9434442866

রাজ্য সিভিল সার্ভিসে সফল সর্বকণিষ্ঠা সানু বক্সি লড়াইয়ের অপর নাম

২৮ জুলাই। শুক্রবার। দুপুর। বৃষ্টিতে ভিজছে ডুয়ার্স। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের ভিতরটা বৃষ্টিতে নয়, আবেগের বন্যায় ভাসছে। একটানা হাততালির মধ্যে একা একটা মেয়ে জীবনে প্রথমবার বক্তা হয়ে এসেছে। ওর কথা শুনতেই এত ভিড়। সানু বক্সি রাজ্যের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতে সম্ভাব্য নবম, মেয়েদের মধ্যে রাজ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় আর সর্বকনিষ্ঠও। এই প্রাপ্তিটুকু ওকে বর্ণনার জন্য কিছুই নয়। এ যেন এক উত্তরণের গল্প।

এই বয়সেই মনীষীদের জীবনের মতো আখ্যান হয়ে দাঁড়িয়েছে মেয়েটির। হাততালি আছড়ে পড়ছে সর্বত্র। কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না, সে-ও তো হারিয়ে যেতেই পারত আর সব সম্ভাবনাময়ীর মতোই। কিন্তু অতল খাদে গড়িয়ে পড়ার আগে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। 'ভাবছি এবার ঘুরে দাঁড়ানোই ভাল'— সেই বিখ্যাত কবিতাটার লাইনটা বোধহয় আত্মস্থ করে ফেলেছিল ও। কিন্তু তবুও এভাবে ফিরে আসা যে যেতে পারে তা মেলানোর আর কোনও উপায় দেখা যাচ্ছে না।

গল্পের শুরুটা যেভাবে হয়েছিল

মেটেলি বাজারে রাস্তার পাশেই ছোট্ট মনিহারি দোকান ছিল সানুদের। সানুই বাড়ির সব থেকে ছোট সদস্য। কিশোরী দামাল মেয়ে। দিদি তানিয়া ওর থেকে বছর দশেকের বড়। পরিতোষ বক্সি আর শংকরী বক্সিদের দুই সন্তানই যে মেধাবী ছাত্রী, সেটা তখন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। বাবা-মা নিজেদের দৈন্যর বাধা টপকে মেয়েদের পড়াশোনাকে গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী সানু ভালভাবে অষ্টম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে উঠে পড়ল। ফ্রক ছেড়ে ঠিকঠাকমতো শাড়িটাও রপ্ত করতে পারেনি যে মেয়েটি, তার জীবনে এবার সব থেকে বড় বিপর্যয় কড়া নাড়ল। বাড়ির নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে বিদ্যুতের খোলা তার খেয়াল করেননি পরিতোষবাবু। মুহূর্তেই নিথর হলেন তিনি। দুই মেয়ে আর মা তখন অকূল পাথারে। গল্পটা সেই থেকেই শুরু।

ফাইট সানু, ফাইট

৮৩ শতাংশ নম্বর নিয়ে মেটেলির স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করল সানু। বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে হলে ১৬ কিলোমিটার দূরে মালবাজার আসা ছাড়া আর কোনওই বিকল্প খোলা ছিল না। মা শংকরীদেবী তখন একা হাতে দোকান সামলাচ্ছেন। বড় মেয়ে তানিয়া দ্রুত সংসারের হাল ধরতে চাকরির চেষ্টা শুরু করেছে। মালবাজার আদর্শ বিদ্যাভবন ডুয়ার্সের শিক্ষাঙ্গনে ঐতিহ্যের সমার্থক শব্দ। অনেক দ্রোণাচার্য-কৃপাচার্য সেখানে ছিলেন, আছেন, থাকবেনও। কিন্তু সানুর প্রয়োজন ছিল একজন ক্ষীরদার। হ্যাঁ, মতি নন্দীর কোনির ক্ষীরদার। বিজ্ঞানের শিক্ষক উৎপল পাল বিজ্ঞান বিভাগের নিঃশুল্ক টিউশন দেওয়া শুরু করলেন

মালবাজার আদর্শ বিদ্যালয় ভবনের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত দত্ত সানু বক্সিকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন।

সানুকে। আর ক্ষীরদার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন ধ্রুবতারা সংস্থার কর্ণধার তথা বাংলার শিক্ষক ইস্রায়েল শেখ। নিজের সন্তানস্নেহের পরশ দিলেন সানুকে। ফাইট সানু, ফাইট-এর সুর উচ্চগ্রামে বেঁধে দিলেন তিনি। ৮৬ শতাংশে উচ্চমাধ্যমিক পেরিয়ে গেল সানু।

নদী নদী নদী সোজা যেতিস যদি

নদী কখনওই সোজা পথে এগয় না। সানুর জীবনটাও নদীর মতোই। বিজ্ঞান নিয়ে কলেজে ভরতি হতে হলে যেতে হবে জলপাইগুড়ি কিংবা শিলিগুড়ি। সেখানে থেকে পড়াশোনা করলে দোকান চলবে কীভাবে? প্রশ্নটা ছোট কিন্তু এর অভিঘাত অনেক অনেক বড়। কলেজের রামধনুর মতো দিনগুলি সারাজীবনকে অক্সিজেন জোগায়, কত রোমাঞ্চ, কত স্মৃতি তৈরি হয় এই সময়টায়। কিন্তু সানু স্বেচ্ছায় কলেজকে টাটা করে দিয়ে দোকানে বসাকেই গুরুত্ব দিল। কলেজের বদলে বিজ্ঞানকে আলবিদা করে দূরশিক্ষার মাধ্যমে ইতিহাসে সাম্মানিক স্নাতকস্তরের পড়াশোনা শুরু করে সানু। চাইলেই জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পরীক্ষায় বসতেই পারত। সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হওয়ার যোগ্যতা আর মেধা দুটোই ছিল তার। কিন্তু মায়ের কাঁধে দোকানের দায়িত্ব ফেলে কোথাও যেতে রাজি ছিল না সানু। কিন্তু তা-ই বলে আটকে থাকল না সে। বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে আটকে গিয়েও নদী যেভাবে এগতে থাকে, ঠিক সেভাবেই এঁকেবেঁকে নদীর জলধারার মতোই সানু এগতে থাকল।

পথের ক্লান্তি ভুলে

দুরূহ যাত্রাপথ। ক্লান্তিকর জীবনযাপনের মধ্যেই পাখির চোখকে লক্ষ্য করে ফেলল সানু। রাজ্যের সব থেকে বড় চাকরি। ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ২০১৬-র লক্ষ্যে মেটেলি থেকেই পড়াশোনা শুরু করে দেয় সানু। পরিবারকে টাটকা বাতাস বইয়ে দিয়ে ২০১৫-তে রেলের সহকারী স্টেশন মাস্টারের পদে চাকরি পেল সানুর দিদি তানিয়া। আর্থিক অসচ্ছলতা এবারে কেটে যাবে। তানিয়াই বোনকে এবারে দোকান বন্ধের পরামর্শ দিয়ে একশো শতাংশ পড়াশোনাতে মন দেবার কথা জানিয়ে দিল। ৬০ শতাংশ নম্বর নিয়ে ইতিহাসে সাম্মানিক স্নাতক হল সানু। সিভিল সার্ভিসের প্রথাগত কোচিং নেবার সামর্থ্য, পরিকাঠামো কোনওটাই নেই। কিন্তু তাতে কী? 'একালের মধুসূদন' ইন্টারনেট তো আছে। রাজ্যের তিন প্রশাসনিক আমলাকে ফেসবুকে খুঁজে ওঁদের সাহায্যে পড়ার ধার ও গতি দুইই বাড়িয়ে দিল সানু। ২০১৬-তে মাত্র ২২ বছর বয়সে গুরুগম্ভীর এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে গেল সানু।

এসো সুসংবাদ, এসো

২৭ জুলাই ২০১৬ রাজ্যে সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। শুধু সফল নয়, মেধাতালিকায় পৌঁছে গেল লড়াকু মেয়েটি। মালবাজার আদর্শ বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত দত্ত ২৮ জুলাই কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই সানুকে সংবর্ধনা দেবার কথা ঘোষণা করলেন। সানুর প্রতি গর্বিত স্কুলের প্রতিনিধিরা যখন ওকে প্রশংসায় ভরাচ্ছিল, তখন মা শংকরী বিশ্বাস শাড়ির আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে নিচ্ছিলেন। বড় আবেগের সেই দৃশ্য সবকিছুকে যখন মিলিয়ে দিল, তখন এরপরেই এই লেখাতে পরদা পড়ে যাবার কথা। কিন্তু না, সেটা হওয়ার নয়, কারণ সানু বলল, দেখা হবে দ্রুত। আরও বড় লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে ও। এবার লক্ষ্য ভারতের সব থেকে বড় চাকরি আইএএস।

সব্যসাচী ঘোষ

অরণ্য মিত্র

পড়ে থাকা নারী শরীরটি পর্যবেক্ষণ করে স্বস্তি পেলেন কনক দত্ত। ওদিকে সুরেশ কুমারেরা পালাচ্ছিল। বুদ্ধ ব্যানার্জি সব জেনে কী বললেন ওদের? পল অধিকারী কি তবে সময় মত পৌঁছোতে ব্যর্থ হলেন? রিসর্টের ভেতরে তল্লাশি চালাতে চালাতে উঠে এলো উদভ্রান্ত দীননাথ চৌহান। আচমকা টর্চের আলো এসে পড়ল হতচকিত কনক দত্তদের মুখে। তা হলে কি পাওয়া যাবে দেবমালার খোঁজ? পরিণতির প্রান্তে এসে দাঁড়ান কাহিনীর অন্তিম লগ্নে হঠাৎ উড়ে এলো স্নাইপারের ছোঁড়া বুলেট। কে মারল কাকে? কেন?

১১২

পড়ে থাকা নারী শরীরটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কনক দত্ত নিশ্চিত হলেন যে দেহটা দেবমালার নয়। কারণ, দেহটার পরনে ছিল শাড়ি। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটার মাথা একদিকে কাত হয়ে আছে। কনক দত্তর মনের মধ্যে এবার একটা সন্দেহ ঘনীভূত হতে শুরু করল। তাঁর মনে হল যে, মৃতদেহটাকে তিনি চিনতে পারছেন। সন্তর্পণে দেহটার কাছে এসে পকেট থেকে ছোট টর্চলাইট বার করলেন তিনি। টর্চের আলোয় কাত হয়ে থাকা মুখটা নিশ্চিত করল তাঁকে।

'শুক্লা দাস!' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। তারপর হাতছানি দিয়ে ডাকলেন পরি ঘোষালকে।

'থ্যাঙ্ক গড!' পরি ঘোষাল দেহটা দেখে স্বস্তির সুরে বললেন। পরক্ষণে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল পুলিশের আর্টিস্টকে দিয়ে আঁকানো স্কেচটার প্রতিচ্ছবি। বিস্মিত সুরে বললেন, 'এ তো মশাই শুক্লা দাস মনে হচ্ছে!'

'পিঠ দিয়ে কমপক্ষে চারটে বুলেটে ঢুকেছে।' কনক দত্ত এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বললেন। এবার তাঁর চোখে পড়ল, আরও একটা দেহ পড়ে আছে বাংলোর সামনে। প্রায় ছুটতে ছুটতে সেই দেহটার সামনে এসে আবার স্বস্তি পেলেন মনে মনে। পড়ে থাকা দেহটা একটা পুরুষের। মাথার সামনে আর পিছনে দুটো ক্ষতচিহ্ন। বুলেটে এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।

'কী হারে গুলি চলেছে, আন্দাজ করতে পারছেন?' এদিক-সেদিক লেগে থাকা গুলির চিহ্নগুলি পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললেন কনক দত্ত।

'এই বডিটা কার?' পরি ঘোষাল একটু ঝুঁকে পড়ে রাজা রায়ের মৃতদেহটা পরীক্ষা করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কি শুক্লা দাসের গ্রুপের লোক?'

'সেটাই স্বাভাবিক। মনে হয় ওদিকটা হল রিসর্টের পিছন দিক।' হাত তুলে বাগানের দিকটা দেখিয়ে জবাব দিলেন কনক দত্ত, 'হামলা ওদিক থেকেই হয়েছিল। সামনের গেট দিয়ে হামলাকারীরা ঢোকেনি।'

'দেবমালা কোথায়?'

'চারপাশটা ভাল করে দেখতে হবে ঘোষালবাবু!' কনক দত্তর স্বরে কাঠিন্য ধরা পড়ে। 'আরও লাশ মিলতে পারে। সুতরাং দেবমালার খবর এখনই অনুমান করা যাচ্ছে না।'

বলতে বলতে বাগানের দিকে এগিয়ে গেলেন কনক দত্ত। চাঁদের আলোয় খুব একটা কিছু আন্দাজ করা যাচ্ছে না। কনক দত্ত সাবধানে টর্চ জ্বেলে বাগানটা যতটা সম্ভব পরীক্ষা করতে করতে এগতে লাগলেন। একটু পরে বুঝতে পারলেন যে, বাগান পেরিয়ে অনায়াসে নদীতে নেমে ওপারে চলে যাওয়াটা খুবই সহজ একটা ব্যাপার। নদীর দিকে প্রাচীর বলতে কিছু নেই। কনক দত্ত এবার নিশ্চিত হলেন যে, হামলাকারীরা নদী পেরিয়েই এসেছিল এবং এ পথ দিয়েই ফিরে গিয়েছে। বাগানের মধ্যে আরও দুটো লাশ খুঁজে পাওয়া গেল। তবে সে দু'জনও পুরুষ।

'এমন হতে পারে যে, দেবমালা রিসর্টের কোনও ঘরে লুকিয়ে আছে!' পরি ঘোষাল বললেন, 'আমাদের উচিত ঘরগুলো পরীক্ষা করা— তবে যে দুটো গাড়িকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম, দেবমালা তাতেও থাকতে পারে।'

কথা শেষ করে পরি ঘোষাল লক্ষ করলেন, কনক দত্ত ধীরপায়ে একটা ঝোপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। টর্চটা নিবিয়ে দিয়েছেন তিনি। ঝোপটা একেবারে কাছে এসে তিনি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন কয়েক সেকেন্ড। ঝোপের ওপাশে ছায়ার মতো কয়েকটা গাছ। পরি ঘোষাল অবাক হয়ে কনক দত্তর গতিবিধি লক্ষ করতে লাগলেন।

হঠাৎ কনক দত্তর টর্চটা জ্বলে উঠল। একটা

আলোর বৃত্ত ফুটে উঠল গাছগুলোর গায়ে। পরি ঘোষাল চমকে উঠে বুঝতে পারলেন যে, গাছগুলোর ফাঁকে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কনক দত্তর রিভলভার ধরা হাতটা সেদিকে তাক করা।

'নড়লেই গুলি করব!'

এবার কনক দত্তর গলা শোনা গেল। কিন্তু টর্চের আলোয় ধরা পড়া মানুষটি দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করেছে। কনক দত্তর কথা শুনে এবার সে হাউহাউ করে বলে উঠল, 'নো শুট সার! আই ইনোসেন্ট পাবলিক! রিসর্ট ম্যানেজার! বিজয় দীননাথ চৌহান সার!'

'বেরিয়ে এসো!' কড়া গলায় নির্দেশ দিলেন কনক দত্ত। পরি ঘোষাল দেখলেন, একটা মোটামুটি লম্বা চেহারার যুবক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে। টর্চের আলোয় তার মুখ উদ্ভাসিত এবং সে মুখটা রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছে।

'এখানে কী করছিলে?' কনক দত্ত ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে দীননাথ হাঁউমাউ করে যা বলল তা থেকে বোঝা গেল যে, নদীর ওপার থেকে সে তিনটে লোককে রিসর্টের দিকে ঢুকতে দেখে বুকিং করা লোকদের একজনকে ফোন করেছিল। তারপর শুরু হয়ে গেল গুলির শব্দ। এতে দীননাথের বেজায় ভয় লাগে। সে মাটিতে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ে। তারপর গুলির শব্দ থেমে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ সব চুপচাপ দেখে সাহস সঞ্চয় করে নদী পেরিয়ে রিসর্টের পিছনে এসে দুটো লাশ দেখে প্রচণ্ড ঘাবড়ে যায়। সে বুকিং করা লোকের নাম্বারে ফোন করে আর সাড়া পায়নি। সে ফোন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরপর দুটো লোককে এগিয়ে আসতে দেখে সে এই গাছগুলোর আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল।

কনক দত্ত সবটা শোনার পর কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা করা হল না। কারণ একটা উজ্জ্বল ও জোরালো আলো এবার এসে পড়েছে তাঁর মুখে। আর আলোর ওপার থেকে শোনা যাচ্ছে একটা কণ্ঠস্বর— 'এবার আপনারা নড়ার চেষ্টা করবেন না মিস্টার দত্ত! একটা এম সিক্সটিন ফোর এ আপনাদের দিকে তাক করা আছে। আর দেবমালা নামের মেয়েটি আপাতত আমাদের হাতে।'

১১৩

প্রথম গাড়িটা চালাচ্ছিল সুরেশ কুমার। গাড়িতে সে একা। পিছনের গাড়িতে মায়াঙ্ক আর মনামি পিছনের সিটে কাঠপুতুলের মতো বসে ছিল আর সে গাড়ি চালাচ্ছিলেন দাসবাবু। গাড়ি দুটো এখন স্বাভাবিক গতিতেই চলছে। দাসবাবুকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না যে, তিনি অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছেন। কিন্তু মায়াঙ্ক আর মনামি তখনও যেন আতঙ্কের ভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি পুরোপুরি। মনামির ডান বাহু থেকে খুব সামান্য রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল। সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বুলেটটা তাঁর বাহুতে সূক্ষ্ম একটা স্পর্শ বুলিয়ে চলে গিয়েছিল। সে বেঁচে গিয়েছে। বুলেট বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দৌড়াবার সময় এই বেঁচে যাওয়ার ব্যাপারটা মাথায় ছিল না তাঁর। রিসর্ট থেকে বেরিয়ে বেশ কয়েক মিনিট ছোটার পর মনামির বাহুতে একটা হালকা জ্বালা টের পায়। রক্ত দেখে মায়াঙ্ক আরও নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল তখন। দাসবাবু সে সময় গাড়িটা প্রায় আশি-নব্বইয়ের গতিতে ছোটাচ্ছিলেন বেশ ঝুঁকি নিয়ে। গয়েরকাটার কাছাকাছি এসে গতি স্বাভাবিক করে স্বাভাবিক সুরে বলেছিলেন, 'তুমি বেঁচে গিয়েছ মেয়ে! বুলেটটা আর হাফ ইঞ্চি ডান দিকে থাকলে প্রচুর রক্ত বার হত। ঢুকে গেলে আরও ঝামেলা ছিল। আরও ডান দিকে সরলে অবশ্য কোনও চাপ ছিল না।'

'গুলির জন্য এটা?' মনামি কোনওমতে জিজ্ঞেস করেছিল। সেই মুহূর্তেই প্রথমবারের জন্য সে উপলব্ধি করল পরিস্থিতিটা। আসলে কতটা ভয়ংকর ছিল সেটা, তা তখনই প্রথম অনুভব করে সে কাঠ হয়ে গিয়েছিল ভয়ে। মৃত্যু তার এত কাছ দিয়ে চলে গেল, কিন্তু টের পেল সে কত পরে!

'তুমি লাকি।' গাড়ির গতি আরও একটু কমিয়ে দাসবাবু সিগারেট ধরিয়ে নিলেন এক হাতেই। তিনি ধূমপান করেন না তেমন। কিন্তু তাঁর সিগারেট খাওয়া প্রমাণ করে দিল যে, তিনি এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। 'শুক্লা দাস আর রাজা রায় অবশ্য নিজেদের ভুলেই মরেছে। কিন্তু তোমরা দু'জন এইরকম সিচুয়েশনে আগে পড়োনি। তাই তোমাদের গুলি খাওয়ার চান্স ছিল সব চাইতে বেশি।'

গয়েরকাটা এসে গেল। সুরেশ কুমার গাড়ি থামিয়েছে একটা ছোট ধাবার সামনে। দাসবাবু সে গাড়ির কয়েক হাত পিছনে থেমে মায়াঙ্কের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'হাতটায় একটা রুমাল বেঁধে দিয়ে নেমে এসো। এই ধাবা হাই ক্লাস হুইস্কি রাখে। কিছুটা অ্যালকোহল পড়লে ইজি ফিল করবে। এ লাইনে মরে যাওয়া লোকদের নিয়ে খুব একটা কিছু ভাবার নিয়ম নেই।'

দাসবাবুর নির্দেশে জড়তা থেকে বেরিয়ে এসে মায়াঙ্ক যত্ন করে তার রুমালটা বেঁধে দিল মনামির বাহুতে। তারপর তার হাত ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল ধাবার ভিতরে। সেখানে প্রায় মাঠের মতো জায়গা। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে টেবিল-চেয়ার পাতা। ওরা চারজন একটা নির্জন টেবিল ঘিরে বসল। গাড়ি থেকে নামার সময় সুরেশ কুমার একটা ছোট ব্যাগ হাতে নিয়েছিলেন। দেখা গেল, তার মধ্যে একটা স্যাটেলাইট ফোন। চিন থেকে আসা সেই ফোন সেটগুলোর একটা। নিরাপদ যোগাযোগ করার কারণে চড়া দাম দিয়ে কিনেছিলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। পয়সা অবশ্য দিল্লি হাই-এর পকেট থেকে গিয়েছে।

'তোমার মোবাইলটা কোথায় ফেলেছ?' স্যাটেলাইট সেটটা চালু করতে করতে জানতে চাইলেন দাসবাবু। যদিও সে ফোন ভুয়ো আইডি দেখিয়ে নেওয়া, কিন্তু দীননাথকে জেরা করলেই সে সেটের নম্বর পেয়ে যাবে পুলিশ। তখন তাদের পক্ষে ট্র্যাক করায় কোনও বাধা থাকবে না।

'ওটা রিসর্টেই ফেলে এসেছি।' সুরেশ কুমার জানায়, 'রিসর্ট ছাড়া সেটটা কোথাও খুব একটা অন করা হয়নি। ওটা কেবল দীননাথের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য। পুলিশ ওটার থেকে কিছু সাহায্য পাবে না।'

'গুড!' দাসবাবুকে প্রসন্ন দেখাল, 'আপাতত এই স্যাটেলাইট ফোনটা ছাড়া আমরা কোনও মোবাইল ব্যবহার করব না। তোমরা তোমাদের সিম কার্ডগুলো খুলে ফেলে ভেঙে ফেলো।'

'কেন?' মায়াঙ্ক বিস্মিত হয়, 'আমাদের সন্দেহ করার কোনও কারণ আছে কি পুলিশের?'

'দীননাথের মুখে বিবরণ শুনে পুলিশ তোমাদের ছবি বানাবে। মনামি বাড়ি থেকে বিয়ের নামে পালিয়েছে। ওর বাবা আজ না হয় কাল ডায়েরি করবে। পুলিশ ওর নাম্বারের লোকেশন খুঁজবে।'

দাসবাবু থামলেন। পানীয় নিয়ে লোক আসছিল। সেসব টেবিলে নিয়ে গেলাস ভাগ করে সবার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা লম্বা চুমুক দিলেন। তারপর মনামি আর মায়াঙ্কের মুখ দুটোয় একবার নজর বুলিয়ে বললেন, 'তোমার আসলে ফেরার হয়ে যাবে। পুলিশ তোমাদের খুঁজবে। আমাদের যেমন খোঁজে!'

'তাহলে?' মায়াঙ্কের গলা শুকিয়ে যায়।

'আমাদের খোঁজে, কিন্তু পায় কি? তোমাদেরও পাবে না।'

অভয়বাক্য উচ্চারণ করে দাসবাবু স্যাটেলাইট ফোনটা নিয়ে ব্যস্ত হলেন। মিনিটখানেকের মধ্যে বুদ্ধ ব্যানার্জিকে পেয়ে গেলেন তিনি। বুদ্ধ ব্যানার্জি বললেন, 'বলো।'

'রিসর্টে আমাদের উপর অ্যাটাক হয়েছিল দাদা।' মৃদু গলায় জানালেন দাসবাবু, 'হাই এন্ড অটোমেটিক গান থেকে ফায়ার করা হয়েছে। টু ক্যাজুয়ালটিস। শুক্লা অ্যান্ড রাজা। বাকিরা সেফ। তবে সিকিয়োরিটি দুটো গিয়েছে। আপনার কাছে কোনও ইনফর্মেশন ছিল না?'

ফোনের ওপার কয়েক সেকেন্ড নীরব রইল। তারপর শোনা গেল বুদ্ধ ব্যানার্জির

কিঞ্চিৎ থমথমে গলা, 'পল কোনও ইনফর্মেশন দেয়নি?'

'না দাদা।'

'আজ বিকেলে পল জানিয়েছিল যে, সে কিছু একটা অনুমান করছে। রিসর্টে তোমাদের উপর হামলা হতে পারে। আমি তাকে বলেছিলাম তোমাদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে।'

'হামলাটা কে করতে পারে, দাদা?' দাসবাবু শান্ত স্বরে কথা বলছিলেন। 'দিল্লি তো আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না শুনেছিলাম। ক্যাভেন্ডিসকে তারা মারিজুয়ানা প্রোডাকশনে নামতে বলেছে।'

'হয়ত প্ল্যান বদল করেছে।' বুদ্ধ ব্যানার্জির স্বর এবার লঘু হল, 'কিন্তু পলের উচিত ছিল কিছু একটা করা। মনে হয়, সে লেট করে ফেলেছে।'

১১৪

টর্চের আলোটা সত্যিই জোরালো। ওপাশের কিছুই দেখতে পারছিলেন না কনক দত্ত। আলোর তীব্রতায় তাঁর চোখ বুজে এল। তিনি দু'হাত উপরে তুললেন।

'বন্দুকটা আলোর দিক ছুড়ে দিন দত্তমশাই।'

কনক দত্ত তা-ই করলেন। ওপাশে কেউ সেটা লুফে নিল। আলোটা এবার মুখ থেকে বুকের উপর নেমে এল। কনক দত্ত একটু একটু করে বুঝতে পারলেন যে, সামনে কয়েক মিটার ব্যবধানে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কেউ একজন চতুর্থ ব্যক্তির হাত ধরে ছিল। সেই চার নম্বর ছায়ামূর্তিটাকে দেবমালা বলে ধরে নিলেন কনক দত্ত।

'এবার আপনারা তিনজন ওই বাংলোর দিক হাঁটতে থাকুন। টেনশনের কারণ নেই। আমরা খুব বাধ্য না হলে আর গুলি চালাব না। প্লিজ মুভ।'

পরি ঘোষাল নিশ্চিত ছিলেন যে, বাংলোর সামনেই হবে তাঁদের ফায়ারিং স্কোয়াড। এবার বুকে বল পেয়ে বললেন, 'ই-ইয়েস! চলুন কনকবাবু!— আরে, এ কী!'

পরি ঘোষালের বিস্ময়ের কারণ আর কিছু নয়। বিজয় দীনানথ চৌহান ধপাস করে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। সম্ভবত জ্ঞান হারিয়েছে সে। ফলে তিনি আর কনক দত্ত হাঁটা ধরলেন বাংলোর দিকে। টর্চ নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাঁদের ফুটফুটে আলোতে বাংলোর সামনে পৌঁছাতে যতক্ষণ লাগল, ততক্ষণ অনুসরণকারীরা কোনও কথা না বলায় পরি ঘোষাল বারবার পিছনে তাকাচ্ছিলেন।

বাংলোর সামনে আলোর কারণে এবার সবাই সবাইকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেল। কনক দত্ত দেখলেন যে, কাঁধে ব্যাগ আর হাতে টর্চ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার চুলে পাক ধরেছে। বাকি দু'জন যুবক। একজনের হাতে ভয়ানক এ ফোর রাইফেল। অপরজন একটা রিভলভার ঠেসে রেখেছে দেবমালার কোমরে।

'আমি একে জেরা করেছি।' দেবমালাকে ইঙ্গিত করে বলল সেই কাঁচাপাকা চুল, 'আপনারা বুদ্ধ ব্যানার্জির লোককে ফলো করে এখানে এসেছেন। সুতরাং এই মুহূর্তে আপনারা শত্রুর শত্রু। কিন্তু আপনাদের টার্গেট শুক্লা দাস বেঁচে নেই। সুতরাং আপনাদের ইনভেস্টিগেশন শেষ। জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন— আপনি শুক্লা দাসকে সন্দেহ করলেন কীভাবে?'

প্রশ্নটা কনক দত্তর উদ্দেশ্যে। তিনি স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'শ্যামল নামের একটা ছেলে নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে এটা হয়েছে। ডিটেইল বলার সময় বোধহয় নেই।'

'আই সি।' বক্তা একটু হাসলেন, 'কন্যাসাথি ছিল বুদ্ধ ব্যানার্জির গোপন ভেঞ্চার। তবে ওরা একটা গলতি করে ফেলেছিল। ট্রাফিকিং-এর জন্য মেয়ে এনে কন্যাসাথির অফিসে এক-আধ দিন আটকে রাখত— একদিন একটা মেয়ে বেরিয়ে এসে চিৎকার করতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেললেও সেটা শ্যামল নামের ছেলেটা শুনে ফেলে। কিন্তু রাত হওয়ায় ফোন করেনি। করেছিল পরদিন সকালে। এরপর শুক্লা দাসের টিম আর কোনও রিস্ক নেয়নি। শিলিগুড়িতে কাজ দেওয়ার নামে নিয়ে গিয়ে খুন করে দেয়। বডি পরে কন্যাসাথির অফিসে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল।'

কনক দত্ত কোনও কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

'আমি এসব জেনেছি ক'দিন হল।' বোসবাবু টর্চটা পকেটে ঢুকিয়ে কনক দত্তর রিভলভার থেকে বুলেটগুলো বার করে নিলেন। তারপর ফাঁকা অস্ত্রটা ছুড়ে দিলেন মালিকের দিকে।

'তবে আপনি বুদ্ধ ব্যানার্জিকে টেনশনে ফেলে দিয়েছিলেন মিস্টার দত্ত। গুড ওয়র্ক। ব্যানার্জি কেন আপনাকে খুন করল না, সেটাই ভাবছি। অবশ্য সে চ্যালেঞ্জ এনজয় করে। আই রেসপেক্ট হিম।'

'আপনারা আসলে কারা?' কনক দত্ত জিজ্ঞেস করলেন এবার।

বোসবাবু আবারও সামান্য হাসলেন, 'সেটা জানাটা জরুরি নয়।' বললেন তিনি, 'আপনারা এখান থেকে ঠিক আধ ঘণ্টা পরে বেরিয়ে চলে যাবেন। রিলিজ হার!'

শেষ নির্দেশটার উদ্দেশ্য ছিল দেবমালাকে ছেড়ে দেওয়া। ছেলেটা রিভলভার সরিয়ে নিয়ে দেবমালার পিঠে একটা হালকা ধাক্কা দিল। দেবমালা সেটার জন্য তৈরি না থাকায় টাল সামলাতে পারল না। সে গিয়ে পড়েছিল বোসবাবুর গায়ে। বোসবাবু চকিতে এক পা পিছিয়ে ধাক্কাটা সামলালেন। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলেন, কিছু একটা নাক ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে বাংলোর দেয়াল থেকে খানিকটা অংশ খসিয়ে দিল।

ব্যাপারটার আকস্মিকতায় সকলেই সেকেন্ডের জন্য থমকে গিয়েছিল। পরক্ষণেই মাটির দিকে ঝাঁপ দিয়ে বোসবাবু চিৎকার করে বললেন, 'স্নাইপার!'

দু'সেকেন্ডের মধ্যে পরের বুলেটটা ছিটকে এল। কিন্তু সেটাও অল্পের জন্য ফসকাল একজনের মাথা। যে ছেলেটা দেবমালার কোমরে গ্লকটা ধরেছিল, সে মাটিতে শুয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় নিখুঁত লক্ষ্যে উড়িয়ে দিল আলোর বাল্‌বটা। ঝপ করে অনেকটা অন্ধকার নেমে এল বাংলোর সামনে।

'গো!' দেবমালার হাত ধরে একটা টান মেরে কনক দত্ত দৌড়ালেন গেটের দিকে। পরি ঘোষালও। তাঁদের দিকে ফিরেও তাকাল না বোসবাবু ও তাঁর অনুচররা। গুলি আসার দিক অনুমান করে তারা তখন ইনফ্রা রেড কাজে লাগিয়ে হামলাকারীকে লোকেট করতে ব্যস্ত।

পল অধিকারীর একটু দেরি হয়েছিল একজন স্নাইপারকে পাঠাতে। সে এসে পৌঁছাবার আগেই রিসর্ট থেকে পালিয়ে গিয়েছিল দাসবাবুরা। কিন্তু স্নাইপারের রাইফেলে সাইলেন্সার থাকলেও ইনফ্রা রেড নেই। দুটো গুলি মিস করার পর সে বুঝল যে, পাখি ফসকে যাচ্ছে। কারণ বাল্‌বটা নিবে যাওয়ার ফলে টার্গেটকে রাইফেলের ভিউফাইন্ডার দিয়ে আর দেখাই যাচ্ছে না। ট্রিগার টেপার মুহূর্তে মেয়েটার ধাক্কায় বোসবাবু নড়ে না গেলে এতক্ষণে এ ফোঁড়-ও ফোঁড় মাথা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

মায়ানমারের অরণ্যে তালিম পাওয়া স্নাইপার রঘু বর্মনের বর্তমান পেশা টোটো গাড়ি চালানো। আলো থাকলে মাত্র পাঁচশো মিটার দূরে থাকা লোকগুলোকে এতক্ষণে সে শুইয়ে দিয়েছে। জোর হাওয়াতেও হাজার মিটার সে বলে বলে লাগায়। লম্বা রাইফেলটা কয়েকটা ভাগে ভাগ করে গুটিয়ে ফেলতে তার সময় লাগে এক মিনিটের কম। অ্যাসেম্বল করতে লাগে পঁয়তিরিশ সেকেন্ড। কিন্তু টার্গেটদের আজ ভাগ্য ভাল।

পরপর তিনটে গুলির শব্দ পেল স্নাইপার। কয়েক ফুট দূরে প্রাচীরের উপর গজিয়ে ওঠা লম্বা লম্বা পাতার একটা টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল। সে আর ঝুঁকি না নিয়ে সরে গেল ধীরেসুস্থে। ওই এম ফোরটায় ইনফ্রা রেড ভিউ আছে। সে জানে।

দেবমালার গাড়িটা বেরিয়ে গেল রিসর্ট থেকে। এবার সব স্তব্ধ। *(ক্রমশ)*

ডুয়ার্স থেকে শুরু

এই পথ যদি না ফ্রেশ হয়...

এক যাত্রায় পৃথকভাবে ঝলমল করছে দেখুন, অতি প্রতিভাবান বালতিবাদক এবং বনেদি ঘরানার তবলাবাদক। হ্যাঁ, তার মধ্যে আবার 'চুনি পান্না'খ্যাত গুণী কমেডিয়ান জানাচ্ছেন, অকাতরে প্রেম বিলানো যায় শুধুমাত্র 'ব্যাটাছেলে' ইলিশের উদ্দেশে। এদিকে ট্রেনের কামরায় কারও বার্থ হারিয়ে যায় তো ওদিকে আবিষ্কার হয় উত্তরবঙ্গের মিষ্টির দোকানের সরেস বৈশিষ্ট্য! চলতি পথের আনাচকানাচে জন্ম নিচ্ছে সোডার বুদ্‌বুদসম বিচিত্র হাসির হররা। আর সেটাই ধ্বনিত হচ্ছে এই যাত্রা আর এই পালায়।

—শেষকালে আমারই কপালে কিনা স্ত্রীলোক ইলিশ?

বিস্ময় এবং আশাভঙ্গের মিশ্রিত স্বরে বলে উঠলেন বাবু বিপ্লবকেতন। হতাশভাবে মাথা নেড়ে তারপর পুরো মাছের বাটিটাই ঠেলে সরিয়ে দিলেন পাতের থেকে দূরে। এবং স্বয়ং নিজে এমনভাবে চেয়ারসুদ্ধু টেবিল থেকে পিছিয়ে বসলেন, যেন তাঁর আহার সমাপ্ত।

বাইরে খুবই বৃষ্টি চলছে তখন। মালদা শহর থেকে একটু বাইরে এই হোটেলটির ডাইনিং রুম, চারতলার উপর একেবারে টঙে। ঘরের একপাশ জুড়ে টানা স্লাইডিং কাচের জানালা, যা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ছে বাইরের চরাচর ভাসানো অবিরাম ধারাস্রোত। দুর্যোগের মধ্যেও হাইওয়ে দিয়ে কিছু ট্রাক ভিজতে ভিজতে গুটিগুটি এগিয়ে চলেছে। আর তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক ট্রাক পথের ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্রামে।

দমকা হাওয়ার খেয়ালে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টিধারার গতিবদল দেখতে বেশ ভাল লাগছিল জানালার বাইরে। এক পেট খিদে এবং উত্তম হুইস্কির মৌতাতে বিজড়িত দশায়, ইলিশ মাছের ঝোল সাঁটানোর একদম আদর্শ মৌসম।

কিন্তু বেঁকে বসলেন বিপ্লবদা। হাত গুটিয়ে বসে এ যেন আচম্বিত ভুখ হরতাল ঘোষণা!

—আরে, কী হল কী বিপ্লবদা?

একদম পিছনের সারির টেবিল থেকে খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল ইভেন্ট ম্যানেজার অর্ণব। এ যাত্রায় অতিথি আপ্যায়নের যাবতীয় দায়িত্ব তারই কাঁধে। মাননীয় বিচারক হাত গুটিয়ে বসলে, তার বসে থাকা একেবারেই মানায় না। তাই তড়িঘড়ি বিপ্লবদার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। সস্নেহে জানতে চাইল, দাদা... হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? আপনি যে একেবারে রেড সিগন্যাল দিয়ে ফেললেন? রান্না ভাল হয়নি?

দূরদর্শনের চূড়ান্ত রমরমার দিনে, সারা বাংলায় কমেডি অভিনেতা হিসেবে খুব নাম হয়েছিল বিপ্লবদার। 'চুনি পান্না' নামক ধারাবাহিকটি ছিল সে সময়কার কমেডি সার্কাস। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সে কি তার আকাশ-ছোঁয়া টিআরপি। আর সেই ধারাবাহিকের কল্যাণেই কলকাতার যে দুই প্রবীণ থিয়েটার অভিনেতা বিপুল সংখ্যক নতুন দর্শকের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন, তাঁরা হলেন বিপ্লবকেতন মুখার্জি এবং

দ্বিজেন ব্যানার্জি। গম্ভীর মুখে কমেডি করায় দু'জনেই অতুলনীয়। বিশেষত বিপ্লবদার ট্রেডমার্ক ছিল কখনও ব্যাজার বা কখনও সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন মুখে সংলাপ আওড়ানো। তাতেই দমফাটা হাসি। সে সময় কয়েক বছরের জন্য তাঁদের জুটিটা প্রায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাঁদা আর ভোঁদার ধেড়ে সংস্করণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল!

অর্ণবের প্রশ্নের জবাবে বিপ্লবদা তাঁর সেই টেলিভিশনখ্যাত ব্যাজার মুখখানি প্রদর্শন করলেন। তারপর করুণ ধরনের এক অদ্ভুত গম্ভীর স্বরে বললেন, ব্যাটাছেলে ইলিশ না হলে, আমি যে এই মাছ ছুঁয়ে দেখি না ভাই!

এবার বলুন, এমন অদ্ভুত ঘোষণা ক'জন শুনেছেন সারাজীবনে? মাছের ব্যাপারেও লিঙ্গবৈষম্য? আমরা সবাই কৌতূহল সহকারে বিপ্লবদার পরবর্তী ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর যে প্রশ্নটি তখন সবার মনে ঘুরছিল, অর্ণবই সেটা প্রকাশ্যে নিয়ে এল— স্ত্রীলোক ইলিশে কীসের আপত্তি দাদাভাই? জানতে পারি কি?

সে কথা শুনে বিপ্লবদার ভুরু দুটো আকাশগামী হয়ে পড়ল। গোল গোল চোখ দুটোকে অগাধ বিস্ময়ের অমনিবাস করে তুলে তিনি বললেন, কী আশ্চর্য! পেটে ডিম এলে ইলিশ মাছের টেস্ট নষ্ট হয়ে যায়, এটাও তোমরা জানো না? ছি ছি ছি! এ তো ইলিশদ্রোহিতা!

—থামুন দাদা, থামুন! অর্ণব রে রে করে পড়ল, 'এভাবে গুজব ছড়াবেন না! সবাই যদি এবার ডিম ছাড়া ইলিশের বায়না ধরে, আমি কিন্তু দিশাহারা হয়ে যাব!'

—সে বললে হবে? অন্তত আমার তো ব্যাটাছেলে ইলিশ চাই-ই চাই।

—আচ্ছা, দাঁড়ান, দেখছি কী করা যায়। হাজার হোক, আপনি বিচারক। আপনার জন্য না হয় বিশেষ ব্যবস্থা!

শেষ দিকের বাক্যটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাকি সবার উদ্দেশে ছুড়ে দিয়ে, অর্ণব দ্রুত হোটেলের কিচেনের দিকে উধাও হয়ে গেল।

এটা একটা ছোট উদাহরণ। মোটামুটি বারো-চোদ্দোজনের একটা দল নিয়ে সে বছর আমরা সারা বাংলায় চক্কর কেটে বেড়াচ্ছিলাম, একটি ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতার প্রাথমিক রাউন্ডের জন্য। আর সমস্ত লোকেশনেই ঘটে চলেছিল এরকম বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা।

আমাদের সেই সমাবেশটিতে নানা বয়সিদের ভিড়। তিনজন মিউজিশিয়ান, দু'জন বিচারক, দু'জন সঞ্চালিকা, এজেন্সি এবং স্পনসর কোম্পানির প্রতিনিধি এবং সর্বোপরি অর্ণবের জোগাড়যন্ত্র বিশারদ কোম্পানি টিএমএস (বিপ্লবদা দু'-একবার গুলিয়ে ফেলে টিএমসি-ও বলে ফেলেছেন)-এর ফিল্ডওয়ার্কের ছেলেরা। কলকাতার বাইরে বাইরে যত ঘুরছি আমরা, স্বাদবদলের আনন্দে ততই মাতোয়ারা হয়ে পড়ছি। কারণ এখানে রুটিনের কোনও নামগন্ধ নেই। প্রায় প্রতিদিনই সকালে ঘুম ভাঙছে এক জায়গায় আর দিনের শেষে ঘুমের দেশে প্রবেশ করছি সেখান থেকে বহু মাইল দূরের অন্য কোনও ঠিকানায়।

শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরে যে রাতে আমাদের ট্রিপ শুরু হয়েছিল, গোটা টিমের এক-দু'জন বাদে বাকি সবাই তখন একেবারে অপরিচিত। কিন্তু আলাপ জমে উঠতে খুব একটা দেরি হয়নি!

দলের মধ্যে মিউজিশিয়ান গ্রুপটাই সব চেয়ে কমবয়সি। তাদের লিডার ঋষি উত্তর কলকাতার এক অতি বনেদি ঘরানার উত্তরসূরি। বাংলা বৈঠকি গান ও টপ্পা আঙ্গিকের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাতি এবং শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে। যদিও বাপ-ঠাকুরদার মতো কণ্ঠসংগীতের দিকে ঝোঁকেনি সে। তার শিল্পকুশলতা বিকশিত হয়েছে তালবাদ্যের জগতে। সদ্য সদ্য ঋষি তখন বলিউডে যতীন-ললিতের সঙ্গে কাজ করে এসেছে। 'ফনা' ছবিতে আমির খানের লিপে 'চাঁদ সিফারিশ' গানটি মনে পড়ে? তার মূল ট্র্যাক পুরোটাই তৈরি হয়েছিল ঋষির তবলার চমকদার প্যাটার্নের ভিত্তিতে। বাইশ থেকে তেইশের মধ্যে ওদের সবার বয়স। এবং এই বয়সের ছেলেরা যখন দঙ্গল বেঁধে রাতের ট্রেনে জার্নি করে, তাদের দেহে বইতে শুরু করে পেঁচার রক্তের প্লাবন। আশপাশের বার্থের জনগণ বিরক্ত স্বরে 'ভাই, একটু আস্তে...', 'ভাই, লাইট নেবাও', 'ভাই, ঘুমাতে দাও' ইত্যাদি প্রতিবাদ আওড়ে আওড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু এদের দমানো অসম্ভব। আর তার উপর আবার এই সুরের সাধকরা কেউই সুবোধ বালক নয়। সুরের সঙ্গে সুরার যোগটা যেন কলা আর কলার খোসা। গভীর রাত অবধি চলল খোসা ছাড়িয়ে আত্ম আবিষ্কারের পালা। বোধহয় তখন রাত আড়াইটে কি তিনটে হবে। উপর্যুপরি তিন-চারটি র‍্যানডম বার্থে হামাগুড়ি দিয়ে ওঠার উপক্রম করে ঋষি কয়েকজনের ঘুম ভাঙাল। এবং সবারই কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে করুণ স্বরে বলল, বড় ঘুম পেয়েছে... কিন্তু বাথরুম থেকে ফিরে কিছুতেই নিজের বার্থটা খুঁজে পাচ্ছি না মশাই!

পরদিন সকাল। এনজেপি স্টেশন থেকে তিনটে গাড়িতে বোঝাই হয়ে আমাদের পুরো দল রওনা হল জলপাইগুড়ির দিকে। পরপর তিন দিন অডিশন। প্রথমটা জলপাইগুড়ি। তারপর কোচবিহার এবং শিলিগুড়ি। এর পরের খেপে আবার তিন দিন হবে বালুরঘাট, রায়গঞ্জ এবং মালদা। তারপর বোলপুর, আসানসোল, বহরমপুর। আর সব শেষে কৃষ্ণনগর, হাওড়া এবং কলকাতা।

তিস্তা ব্যারেজের পাশ দিয়ে ছুটছে গাড়ি। বাঁ পাশে আকাশের গায়ে ঝাপসা নীল পাহাড়ের স্থিরচিত্র। সেখানে মেঘের ফাঁকে কখনও কখনও কাঞ্চনজঙ্ঘার মুকুট ফুটে উঠছে। আমাদের গাড়িতে কে যেন হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠল, এই পথ যদি না শেষ হয়! আমি না পেরে বলেই ফেললাম... গানটা হওয়া উচিত, এই পথ যদি না ফ্রেশ হয়! সারা রাত জাগার পর স্টেজে যদি ঝিমুনি চলে আসে?

ঋষি হো হো করে হেসে উঠল। বলল, নো চান্স! আজকে এমন পারফর্মেন্স হবে, যেন দর্শক-শ্রোতার দু'রাতের ঘুম চলে যায়!

দলের মধ্যে মিউজিশিয়ান গ্রুপটাই সব চেয়ে কমবয়সি। তাদের লিডার ঋষি উত্তর কলকাতার এক অতি বনেদি ঘরানার উত্তরসূরি। বাংলা বৈঠকি গান ও টপ্পা আঙ্গিকের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাতি এবং শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে।

তারপরেই সে গল্প জুড়ে দিল, ফাংশন ধরার জন্য তার দাদু এবং বাবার এজেন্টদের মধ্যে কীরকম রেষারেষি চলে। বিশেষ করে শ্রাদ্ধবাসরে গানের জন্য যখন বনেদি বাড়িগুলো থেকে বড়সড়ো বায়না আসে, তখন প্রতিযোগিতা একদম তুঙ্গে। গায়কের বাড়ি অবধি পৌঁছাবার আগে শ্যামবাজার মোড়েই নাকি পার্টির হাত ধরে টানাটানি জুড়ে দেয় দু'পক্ষের এজেন্ট! একজন যদি বলে, বড়বাবু থাকতে আবার অন্য কাউকে কী দরকার... অন্যজন তখন হুংকার দিয়ে বলে, বাজে কথায় কান দিচ্ছেন কেন মশাই? বড়বাবুর এখন রীতিমতো দমে টান ধরে। তিন-চার ঘণ্টার ফাংশন ছোটবাবু ছাড়া কেউ টানতে পারবে না!

—অ্যাই ঋষি... এত গুলগল্প ঝাড়িস না! অর্ণব ধমকে বলল। এত বড় আর্টিস্টি ওঁরা। এরকম করতে পারেন কখনও?

কিন্তু ঋষির খিকখিক হাসি থামে না। ও বলল, নিজেরা ডিরেক্টলি না করুক... এজেন্টকে লেলিয়ে তো দেয়। আর বোম, তুই ওইটা বল... তুই প্যাড বাজাস শুনে দাদু কী বলেছিল?

কিছু বলার আগেই ঋষি, বোম আর

পিন্টু নিজেদের মধ্যেই হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগল ওই প্রসঙ্গ ওঠায়। হাসির হেঁচকির ফাঁকে ফাঁকে বলা টুকরো কথাগুলো থেকে বহু কষ্টে ব্যাপারটা বুঝতে হল। অক্টোপ্যাডবাদক বোম যখন দাদুকে বলে সে 'প্যাড' বাজায়, দাদু তাতে একেবারে স্তম্ভিত। কারণ 'প্যাড' বলতে তিনি ধরে বসেছিলেন, সেটা স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্যাড। ফলে ভীষণই খেপে গিয়ে গুষ্টির তুষ্টি করে বলেছিলেন, এইসব উজবুক ছেলের সঙ্গে তুই গানবাজনা করিস? বংশের নাম ডুবিয়ে ছাড়বি দেখছি!

জলপাইগুড়ির জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম অবশ্য মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল ওদের দলের মাপা পারফর্মেন্সে। তবলা, ঢোল এবং অন্যান্য পারকাশন ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে বসার জন্য স্টেজে একটা চৌকি দরকার ছিল ঋষির। কিন্তু তা পাওয়া যায়নি বলে সটান মাটিতেই ফরাশ পেতে বসে পড়ল সে। চকচকে দু'চোখের কৌতুক আর ঠোঁটের কোণে ফচকে হাসিটায় কোনও পরিবর্তন নেই। বিচারক, প্রতিযোগী এবং দলের বাকি মিউজিশিয়ান... সবার চেয়ে নিচু আসনে বসেও সে কিন্তু দারুণ উঁচুমানের পারফর্মেন্সে সবাইকে ছাপিয়ে গেল।

জেলা পরিষদের এই অডিটোরিয়ামটি আমার কাছেও এক মস্ত নস্টালজিয়া। ছাত্রজীবনের শেষ ভাগে, বলতে গেলে আমাদের চোখের সামনেই এই ভবনটি গড়ে উঠেছিল। আর একই সময় সুমন, নচিকেতা এবং অঞ্জন দত্তর অন্য ধারায় গান আমাদের জীবনকেও বদলে দিচ্ছিল। গিটার বাজিয়ে সেইসব গান গাইতে গাইতে একসময় কয়েকটা নিজের গানও বেঁধে ফেলেছিলাম। জনসমক্ষে যে গানের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখার প্রথম সুযোগ হয়েছিল এই মঞ্চেই।

গাইতাম আমরা দু'জনে মিলে। আর ঘটনাচক্রে দু'জনেরই নাম অভিজিৎ! ইগলস বা স্করপিয়নস-এর মতো ওয়েস্টার্ন গ্রুপের গান খুব ফলো করতাম দু'জনেই। ফলে নিজেদের গানেও ভোকাল রিফ্রেন বা হারমনির মতো কারিকুরি দিব্যি জুড়ে নিয়েছিলাম। আজ ভিডিয়ো ক্যামেরা হাতে ইভেন্ট কভার করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল, দর্শক আসনের মাঝে এরকমই একটা জায়গায় সে দিন ক্যামেরা বসিয়েছিল বুবুন, আমাদের গানের ভিডিয়ো রেকর্ডিং করতে। তখন বুবুনের সঙ্গে আলাপ ছিল না। পরে সেই ভিডিয়োটা দেখতে গিয়েই জর্জ মাইকেলের ফ্যান বুবুনের সঙ্গে বন্ধুত্ব শুরু হয়। যে বন্ধুত্ব না হলে, স্টিল এবং মুভি ক্যামেরার টেকনোলজি সম্বন্ধে অনেক কিছুই সেই বয়সে অজানা রয়ে যেত। এটা ভাবতে সত্যিই গর্ব হয় যে, সেই সময়কার মফস্‌সল শহরে বসেও কতভাবে নিজেকে শিক্ষিত করার সুযোগ পেয়েছি এক-একজন অসাধারণ বন্ধুর সান্নিধ্যে।

যা-ই হোক, জীবনে প্রথমবার নিজের লেখা গান দর্শকদের সামনে গাইছি এবং সেটার আবার ভিডিয়ো রেকর্ডিং হচ্ছে... সে এক বিপুল উত্তেজনার ব্যাপার। দ্বিগুণ উৎসাহে তেড়েফুঁড়ে গান গেয়েছিলাম আমরা দুই অভিজিৎ মিলে। আর হল ভরতি দর্শকদের সমবেত হুল্লোড় সে দিন এমন এক অসাধারণ আনন্দের অনুভূতি উপহার দিয়েছিল, যার কোনও তুলনা হয় না!

অমন একটা সফল শো শেষে সেলিব্রেট করার ইচ্ছে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সমবেত বন্ধুদের এক অংশ দাবি তুলল হল থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে বাঁক নেওয়ার। গন্তব্য, টাউন স্টেশন এবং তিন নম্বর গুমটির মধ্যবর্তী পরোটার দোকান। সেইসব সারি সারি দোকানের প্রায় প্রত্যেকটির পিছনেই একটি করে গুপ্ত কেবিন আছে, যেখানে পরিবেশিত হয় দোকানের সিলিং বা মেঝের পাটাতনের নীচ থেকে বার করে আনা ভুটানি মদ।

তবে ভাগ্য খারাপ। সে দিন সন্ধেয় পকেটে রেস্তর যা দশা ছিল, তাতে ওই রেস্তরাঁর চিঁড়ে ভিজবে না। অগত্যা তাই রাস্তা পার হয়ে অডিটোরিয়ামের উলটো পাশের মিষ্টির দোকানে ঢুকে পড়লাম সবাই। উদ্‌যাপন হল চা আর শিঙাড়া দিয়ে।

ময়নাগুড়ি বাইপাসের ধারে এক ধাবাতে ডিনারের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে এই গল্প শোনাচ্ছিলাম অর্ণব আর এসডিবি-কে। গরম চিকেন পকোড়ায় ফুঁ দিতে দিতে এসডিবি বলল, নর্থ বেঙ্গলের কিন্তু এটা একটা বিশেষত্ব বলতে হবে। বেশির ভাগ দোকানেই চা সার্ভ করে। চা-বাগানের দেশ বলে কথা! আমি ভেবে দেখলাম, ব্যাপারটা সত্যিই তা-ই। কলকাতার মতো চায়ের দোকান আর মিষ্টির দোকানে স্পষ্ট শ্রেণিবিভাজন নেই এখানে। বেলাকোবার বিখ্যাত চমচমের দোকানেও, চাইলে চা মিলবে। আর মিষ্টির সিরা মিশ্রিত সেই চায়ের একটা ভিন্ন আমেজও আছে।

—আরে, ওসব ছাড়ো। শুধু স্টেজে গান গাওয়ার গল্প শোনালে চলবে না। বাকি রাস্তাটা কিন্তু এবার আমরা গাড়িতে গান গাইতে গাইতে যাব! গেলাসে গেলাসে নিখুঁত মাপে পেগ ঢালতে ঢালতে অর্ণব বলল।

দলের বাকি সব রথী-মহারথী অডিশন শেষে জলপাইগুড়ির ডেল প্রীতমে রয়ে গিয়েছে। শুধু আমরা চার-পাঁচজন গ্রাউন্ড স্টাফ রওনা হয়ে পড়েছি কোচবিহার, পরদিনের সব ব্যবস্থা আগাম সেরে রাখার দায়িত্ব পালন করতে। খুব ইচ্ছে ছিল, ডিনারটা হবে বিখ্যাত ঝাঝাঙ্গি ধাবায়। কিন্তু তিস্তা ব্রিজ পেরতেই খিদের জ্বালায় সবাই এতই কাহিল যে, প্রথম যে ভদ্রস্থ ধাবাটি পড়ল, সেখানেই গাড়ি সাইড।

—গান হবে, খুব ভাল কথা। হাত বাড়িয়ে নিজের গেলাসটা হস্তগত করল এসডিবি। তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, কিন্তু, আমার একটা প্লাস্টিকের বালতি চাই।

প্লাস্টিকের বালতি! শুনেই মনে আশঙ্কা জাগল, গাড়িতে বমি করবে নাকি?

অর্ণব অবশ্য সহাস্যে সে ভয় দূর করে দিয়ে বলল, এই বালতি ছাড়তে পারলে না বলেই তোমার দ্বারা বড় মিউজিশিয়ান হওয়া হল না। না হলে, আজ এই ইভেন্টের বেগার খাটার বদলে তুমিও হয়ত ঋষির মতো স্টেজেই বাজিয়ে বেড়াতে!

রহস্যের পরদাটা পুরোপুরি সরল, অর্ণব আরেকটু বিশদে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করায়। এসডিবি-র পেটে মাল পড়লেই নাকি ঘাড়ে তালবাদ্যের ভূত ভর করে। কিন্তু আর অন্য কিছু নয়, শুধু বালতি বাজিয়েই তার আনন্দ। বন্ধুদের বাড়িতে যখনই আসর বসে, কয়েক পেগের পর এসডিবি অবধারিতভাবে বাথরুমে বালতির খোঁজে হানা দেবেই দেবে।

কিন্তু ধাবাতে আর বালতি কোথায়? এসডিবি অবশ্য গোঁ ধরেছিল, অন্তত একটা প্লাস্টিকের জগ কিংবা মগ যদি ঝেড়ে নেওয়া যায়। অর্ণব চোখ পাকিয়ে ধমকে-ধামকে কোনওরকমে তাকে নিরস্ত করল। আর আমি সান্ত্বনা দিতে বললাম, গাড়ির সিটে বাজিয়ো। সামথিং ইজ বেটার দেন নাথিং।

কোচবিহারের রাস্তা খুব খারাপ ছিল সেই বছর। আমাদের মারুতি গাড়িটা টাট্টু ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিল সেই খানাখন্দময় রাস্তায়। মধ্যরাতে সেই অবস্থায় গানও চলছিল, যে যেমন পারে। আর এসডিবি কখনও গাড়ির সিটে, কখনও দরজায়, কখনও ছাদে অবিরাম বাজানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু গাড়ির ভিতরে বাজিয়ে তার জুত হচ্ছিল না কিছুতেই। কিন্তু ওই যে বলে না, নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অব ইনভেনশন! শেষ অবধি একটা পন্থা সে ঠিক বার করে ফেলল।

সে রাতে ধূপগুড়ি টু কোচবিহার রুটে যেসব গাড়ি ওই সময় যাতায়াত করছিল, তাদের কেউ কেউ হয়ত সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে। মারুতি গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে অর্ধেক শরীর বার করে একটা লোক এক হাতে তেড়েমেড়ে তাল বাজাচ্ছে সেই গাড়ির ছাদে। গাড়ির বাকি যাত্রীরা টেনেটুনে কোনওমতে তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেও, খানিক বাদে আবার সে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসছে। উফ! সে যেন প্রলয়নৃত্যের ডম্বরুবাদন। ভাগ্যিস, সেই পথ একসময় শেষ হয়েছিল!

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

মাইক্রো আর্ট ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে শিলিগুড়ির রমেশ

বলিউডের চিত্রতারকারদের সঙ্গে রমেশ শা

মাইক্রো আর্ট দিয়ে ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুললেন শিলিগুড়ি চম্পাসারির মাইক্রো আর্টিস্ট রমেশ শা। এখন তাঁর লক্ষ্য, গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নিজের নাম তোলা।

একটি চালের দানায় ভারতের ১১৫টি মানচিত্র, আবার একটি সরষের দানায় বিশ্বের মানচিত্র। একটি পোস্টকার্ডে পেনসিল দিয়ে ৮৬ হাজারবার রামনাম লেখা। খালি চোখে এইসব মাইক্রো আর্ট করে ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস থেকে শংসাপত্র আর মেডেল পেলেন শিলিগুড়ি চম্পাসারি সমর নগরের মাইক্রো আর্টিস্ট রমেশ শাহ। এবারে তিনি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নিজের নাম তোলার জন্য আবেদন শুরু করলেন।

১৯৯৪ সাল থেকে রমেশ শা তাঁর এই অতি ক্ষুদ্র শিল্পকর্ম শুরু করেন। খালি চোখে তিনি চালের দানা, সরষের দানা বা ডালের দানায় ওইসব ব্যতিক্রমী কাজ করলেও সাধারণ মানুষকে তা দেখতে হবে চোখে লেন্স লাগিয়ে। প্রয়াত সংগীতশিল্পী মান্না দে থেকে শুরু করে কপিল দেব, শাহরুখ খান, জয়াপ্রদা, শিল্পা শেট্টি-সহ আরও অনেক সেলিব্রিটি তাঁর শিল্পকর্ম দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন। ২০০১ সালে দিল্লিতে তিনি তাঁর ওইসব শিল্পকর্ম নিয়ে প্রদর্শনী করলে সেই সময়কার সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ছাড়াও ৩২ জন সাংসদ তা দেখতে হাজির হন। চাল আর সরষের দানায় সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম করার পাশাপাশি ৫ মিলিমিটার ও ৪ মিলিমিটার আকারের একটি ছোট বই তৈরি করেছেন রমেশ। তাঁর দাবি, ওই বই বিশ্বের সবচেয়ে ছোট বই। বইটিতে বিশ্বের ২২৩টি দেশের নাম লেখা আছে, তা ছাড়া ৬৫ জন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির নামও লেখা আছে। ৫ মিলিগ্রাম ওজনের একটি গান্ধি-চশমাও তৈরি করেছেন তিনি। টানা তিন মাস ধরে তৈরি করা সেই চশমা বিশ্বের সবচেয়ে ছোট চশমা বলেও দাবি রমেশের। একটি চালের দানায় তিনি লিখেছেন 'বন্দে মাতরম্' সংগীত। নখের উপরও অনেক কাজ রয়েছে তাঁর। তবে এখন পাহাড়ে অশান্তি চলতে থাকায় তার উপর শান্তির আবেদন নিয়ে এই মাইক্রো আর্টিস্ট কাজ শুরু করেছেন। বিভিন্ন স্থান থেকে রমেশ সংবর্ধনা পেয়েছেন। দু'দিন আগে ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস থেকে তাঁকে ওইসব কাজের জন্য শংসাপত্র পাঠানো হয়েছে। রমেশ এখন শিলিগুড়ির গায়ে একটি মিউজিয়াম তৈরির জন্য প্রয়াস নিয়েছেন। তিনি জানালেন, চাল, সরষে, ডালের উপর তিনি যে দু'হাজারেরও বেশি সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম করেছেন, সেইসব দিয়েই তিনি মিউজিয়াম তৈরির প্রচেষ্টা নিয়েছেন। আর সেটা তৈরি হয়ে গেলে তা হবে বিশ্বের প্রথম মাইক্রো আর্টের মিউজিয়াম।

বা ঘো

আশি বছর ধরে নেতাজীর অটোগ্রাফ আগলাচ্ছেন মহাশ্বেতা

পুরনো সেই কাঠের বাড়ি আর নেই শিলিগুড়ি শহরে। সব ভেঙেচুরে কংক্রিটের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। আর এর মধ্যেই পুরনো কাঠের বাড়ি বাঁচিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নিজে হাতে লেখা একটি অটোগ্রাফ টিকিয়ে রেখেছেন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর নাতনি মহাশ্বেতা মহলানবিশ। শিলিগুড়ি মাল্লাগুড়িতে তাই মহাশ্বেতাদেবীকে নিয়ে উৎসবের শেষ নেই। স্বাধীনতা দিবসের আগে এই উৎসাহ আরও বেড়ে যায় প্রতি বছর। এবারেও তাতে খামতি নেই। আর মহাশ্বেতাদেবী অগস্ট মাস পড়তেই নেতাজির সেই বাঁধানো অটোগ্রাফ ট্রাঙ্ক থেকে বের করে মোছামুছিতে মেতেছেন। তার কথায়, ২৩ বা ২৬ জানুয়ারি এলে যেমন দেশ নায়কের এই অমূল্য অটোগ্রাফ মোছামুছি করতে তিনি মেতে ওঠেন তেমনই ১৫ অগস্টের আগে অগস্ট মাস পড়লেও তা নিয়ে তিনি মেতে ওঠেন। শিলিগুড়িতে নেতাজি স্মৃতি বিজড়িত হারমোনিয়াম নিয়ে বেঁচে থাকা সুস্বেতা বসু ও সংগীত শিল্পী শিল্পী পালিত বলেন, তারা স্বাধীনতা দিবস স্মরণে নেতাজির অটোগ্রাফ নিয়ে পুরনো কাঠের বাড়িতে বেঁচে থাকা মহাশ্বেতা মহলানবিশকে নিয়ে বিশেষ কিছু অনুষ্ঠানের কথা ভাবছেন।

কী আছে সেই অটোগ্রাফে? তাতে লেখা, সেবা ও ত্যাগ ব্যতীত স্বাধীনতা পাব না। স্বাক্ষর করা আছে শ্রী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সময় ১৯-৯-১৯৩৮। কিন্তু কীভাবে নেতাজির হাতে লেখা তার বাণী সমেত সেই অটোগ্রাফ মহাশ্বেতাদেবীর কাছে এল? মহাশ্বেতাদেবীর বক্তব্য, তিনি এটা তার মা প্রয়াত মমতা মহলানবিশের কাছ থেকে পেয়েছেন। তার মাসি প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী অনিতা বসু ওরফে চৌধুরী তার মাকে এটা দিয়ে গিয়েছিলেন। তার দাদু মানে অনিতা বসুর বাবা ক্ষিতীশচন্দ্র বসু রেঙ্গুনে আইন অনুশীলন করতেন। মাসি সেখানেই থাকতেন আর নেতাজির ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে গোপনে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করতেন। ১৯৩৮ সালে নেতাজি রেঙ্গুনে গেলে তার মাসি নেতাজির সঙ্গে দেখা করেন। আর সেই সময় নেতাজি সেই বাণী নিজে হাতে লিখে অটোগ্রাফ দেন।

মহাশ্বেতাদেবীর বাড়ি শিলিগুড়ি ছাড়া কলকাতায়ও ছিল, লেক ভিউ রোডে। সেখানেই একবার তার মাসি এলে সেই অটোগ্রাফ তার মায়ের কাছে দিয়ে যান তিনি। তারপর মায়ের কাছ থেকে মহাশ্বেতাদেবী তা নিজের কাছে নেন। এবং প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি ও ১৫ অগস্ট এলে তিনি সেই অটোগ্রাফকে অন্যরকমভাবে শ্রদ্ধা জানাতে শুরু করেন। অটোগ্রাফের মধ্যে নেতাজির একটি ছবিও তিনি সেঁটে রেখেছেন।

বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর নাতনি হলেন মহাশ্বেতাদেবী। এখন তার বয়স চলছে ষাট বছর। জগদীশ চন্দ্র বসুর খুড়তুতো ভাই ক্ষিতীশ চন্দ্র বসুর মেয়ে হলেন মহাশ্বেতাদেবীর মা মমতা মহলানবিশ। তাছাড়া জগদীশ চন্দ্র বসুর বাবা ভগবান চন্দ্র বসু আর মমতাদেবীর ঠাকুরদা ঈশ্বর চন্দ্র বসু ছিলেন আপন ভাই। সেই সূত্রে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশ্বেতাদেবীর দাদু। গোটা শিলিগুড়ি পুরনো সব কাঠের বাড়ি ভেঙে নতুন বিল্ডিং তৈরিতে মেতে উঠলেও মহাশ্বেতাদেবী পুরনো স্মৃতি ধরে রাখতে কাঠের বাড়ি এখনও রেখে দিয়েছেন। এখন তিনি যে বাড়িতে রয়েছেন সেটি ১৯৫৪ সালে শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট স মিল থেকে নিলাম করে আনা কাঠ দিয়ে তৈরি। তার বাবা প্রয়াত নৃপেন্দ্রনাথ মহলানবিশ মাত্র তিন হাজার টাকা দিয়ে সব কাঠ নিলাম করে এনে এই বাড়ি তৈরি করেন। মহাশ্বেতাদেবী বলেন, মণীষী জগত মোহন তর্কালঙ্কারের নাতি মিহির কিরণ ভট্টাচার্য ছিলেন তার গুরুদেব। সেই গুরুদেবের নাতনি দীপা সেনগুপ্ত ও তার নাতনি জামাই প্রমিত সেনগুপ্ত আশির দশকে বার কয়েক ওই কাঠের বাড়ি আসেন। সেই স্মৃতি ধরে রাখা আর ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হওয়ায় তিনি পুরনো কাঠের বাড়ি এখনও ভেঙে ফেলেননি বলে মহাশ্বেতাদেবী জানান।

বা ঘো

খেলাধুলায় ডুয়ার্স

আরএসএ-র ফুটবল টুর্নামেন্ট

প্রতি বছরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হল রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত এসআরএমবি চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যান্ড পল্টু মোদক, রজত ঘোষ মেমোরিয়াল রানারস আপ নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। ৫ অগাস্ট থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় জলপাইগুড়ির আরএসএ, রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার ফুটবল কোচিং সেন্টার, জলপাইগুড়ি সাই ফুটবল দল, যুব মঞ্চ, শিলিগুড়ির রামকৃষ্ণ সংঘ, রয়্যাল এফসি, রানিডাঙা এসএসবি, আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ। ১৩ অগাস্ট ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলাগুলি হয় জলপাইগুড়ির টাউন ক্লাব ময়দানে। আরএসএ-র এই ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখতে প্রতিদিন প্রচুর ফুটবলপ্রেমীর ভিড় ছিল লক্ষণীয়। এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে প্রতিবারের মতো এবারও জেলার কৃতী ও প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা জানানো হয় উদ্যোক্তাদের তরফে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ছবি- সৌমেন সেন

বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনকে অত্যাধুনিক করার লক্ষ্যে পরিদর্শন

জলপাইগুড়ি শহরের বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গন বর্তমানে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া বা সাই-এর নিয়ন্ত্রণাধীন। ইতিমধ্যে এখানে ফুটবল এবং অ্যাথলেটিক্সের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এখানে সাই-এর পক্ষ থেকে তিরন্দাজি, সাঁতার, তাইকোন্ডোসহ বেশ কিছু খেলার প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনের বর্তমান সামগ্রিক পরিকাঠামো পরিদর্শন করলেন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণমন্ত্রকের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সৈয়দ আহমেদ বাবা এবং সাই-এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ডিরেক্টর মনমিত সিং গোন্ডি। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক রচনা ভগত। তাঁরা বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গন ঘুরে সংবাদমাধ্যমকে জানান, এই ক্রীড়াঙ্গনে আধুনিক মানের আট লেনের সিন্থেটিক ট্র্যাক গড়ে তোলা হবে। সাই-এর সেন্টার ফর এক্সেলেন্সি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে। এই ক্রীড়াঙ্গনের পরিবেশ ও সামগ্রিক দিক দেখে খুশি হয়েছেন পরিদর্শনকারী দলের সদস্যরা। তাঁদের মতে, আগামীতে বেঙ্গালুরু, দিল্লি, কলকাতা ও পাতিয়ালার পর জলপাইগুড়ি হতে চলেছে সাই-এর আদর্শ প্রশিক্ষণকেন্দ্র।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ছবি- সৌমেন সেন

আলিপুরদুয়ার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ ২০১৭

গত ২৩ জুলাই আলিপুরদুয়ার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ শেষ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় তাসাতি বীরপাড়ার ডুয়ার্স ফুটবল অ্যাকাডেমি আলিপুরদুয়ার বাবুপাড়া ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়ে জয়ী হয়। এই দু'টি টিমই আগামী বছর অনুষ্ঠেয় সুপার ডিভিশন লিগে খেলার যোগ্যতা পেয়েছে। ২৪ জুলাই বীরপাড়ার জুবিলি ক্লাব কামাখ্যাগুড়ির ইয়ুথ স্পোর্টস ক্লাবকে ৬-১ গোলে হারিয়ে ২০১৭ সালের সুপার ডিভিশন লিগে বিজয়ী হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস অ্যাসোসিয়েশন এই দু'টি লিগের আয়োজন করে। মোট ২৭টি টিম প্রথম ডিভিশন লিগে এবং ১২টি টিম সুপার ডিভিশন লিগে অংশগ্রহণ করে। সমস্ত খেলা আলিপুরদুয়ারের তিনটি মাঠে আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও বীরপাড়া, মাদারিহাট, ফালাকাটা এবং জয়গাঁর দলসিংপাড়ায় কিছু ম্যাচ হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ১১০টি ম্যাচ খেলা হয়। এই লিগ শুরু হয়েছিল ১৫ মে ও শেষ হয় ২৪ জুলাই, ২০১৭। ১৪ অগাস্ট আলিপুরদুয়ার সিনিয়র ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল টিমকে চন্দননগরে (হুগলি) ২০১৭ সালের বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানে জুন-জুলাই মাসে সল্ট লেকের সাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আয়োজিত স্টেট অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০১৭-য় পদক জয়ের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলার চারজন অ্যাথলিটকেও একই সঙ্গে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। এ ছাড়াও অন্য কয়েকটি সংস্থাকেও পুরস্কার দেওয়া হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক সৈকত সরকার

মিড ডে মিলে মাশরুম !

শিশুদের পুষ্টির সঙ্গে আনতে পারে মায়েদের স্বনির্ভরতা

না একে আবার গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নমূলক সরকারি কোনও প্রচারপত্র ভেবে না বসাই ভাল। এমন বলিষ্ঠ ভাবনা আসছে প্রাথমিক স্কুলের কোনও শিক্ষকের মাথায়, (যে পেশার নাম শুনলে আজকাল মধ্যবিত্তের মনে জাগে একরাশ অবজ্ঞা এবং ঘৃণা) শুনে কিঞ্চিৎ অবাক লাগে বইকি! তাও আবার সেই শিক্ষক কোনও নামকরা ইস্কুলের নন, রাজ্যের প্রত্যন্ত জেলা কোচবিহারের সীমান্ত শহর দিনহাটা থেকে পনের কিলোমিটার দূরের এক গাঁয়ের। সে গাঁয়ের নাম কিশামত দশগ্রাম, ব্লক দিনহাটা-২। কেবল ভাবনাই নয়, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কয়েকমাস ধরে লেগে থেকে অবশেষে সে ভাবনা বাস্তবায়িত করে ছেড়েছেন সেই শিক্ষক। এখন সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিলের পাতে মাঝে মধ্যেই পড়ছে মাশরুমের ব্যঞ্জন। খেতে মন্দ নয় মোটেই,

পুষ্টির কথা এক লাইনে বলা সম্ভব নয়। আর সে মাশরুমের চাষ হচ্ছে গাঁয়ের বাড়িতে বাড়িতে, মাশরুম বিলি করা হচ্ছে আশপাশের গাঁয়ের স্কুলেও। কোনও স্কুলে এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। স্বভাবতই উত্তেজিত গাঁয়ের মানুষ, মহা উৎসাহে চলছে মাশরুম চাষ। ও হ্যাঁ, আসল কথাটাই বলা হয়নি, সেই শিক্ষকের নাম সৈকত সরকার।

মাশরুমের পুষ্টিগুণ নিয়ে সেরকম ধারণা আমাদের কারুরই খুব একটা নেই, থাকার কথাও নয়। সৈকতই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন, পৃথিবীতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ধরনের ছত্রাক জন্মায়, যার মধ্যে মাত্র দু' হাজার শ্রেণির মাশরুম মানুষের খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। আমাদের দেশে মাত্র তিন ধরনের মাশরুম খাবার হিসেবে চাষ করা হয়। সৈকতের কাছ থেকেই জানা গেল, মাশরুমের খাদ্যগুণ অপরিসীম। প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থে ভরা মাশরুম শিশুদের হাড় ও দাঁতের গঠনের উপযোগী। বহুমূত্র, উচ্চ রক্তচাপ, বেরিবেরি ইত্যাদি রোগের উপশম ঘটাতে সাহায্য করে মাশরুম বা ছত্রাক।

কিন্তু একার প্রচেষ্টায় এতবড় ভাবনাকে গণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন সরকারি সাহায্য। সৈকত জানালেন, প্রথমে কৃষি দপ্তর এগিয়ে এসেছিল বিদ্যালয়ে চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিডিও দেবল কুমার উপাধ্যায় (বিদায়ী) ও অমর্ত্য দেবনাথ (বর্তমানে নিযুক্ত)। প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও বীজ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ব্লক ও মহকুমা স্তরের কৃষি আধিকারিকরা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মুক্তি রায়, সহ সভাপতি খগেশ্বর রায় এই উদ্যোগের কথা জানতে পেরেই উৎসাহী হয়ে এসে ঘুরে দেখে যান এবং আশ্বাস দেন সাহায্যের। জেলাপরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মমতাজ বেগম মায়েদের তৈরি এই মাশরুম বাজারজাত করা হবে বলে আশ্বাস দেন। এমনকি সদ্য যোগ দেওয়া জেলা সমাহর্তা কৌশিক সাহাও সব শুনে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বলে গর্বের সঙ্গে জানালেন সৈকত। কিন্তু তাঁর আক্ষেপ, সবই যেন বড় মন্থর গতিতে চলছে, সরকারি সাহায্যও সেরকম কিছু এ যাবৎ মেলেনি। তবু দোরে দোরে ঘুরে সৈকত আজও ক্লান্ত হননি, বরং তিনি ভীষণ আশাবাদী। আশ্বাসও মিলেছে দারুণ।

তাঁর কথায়, এতে গ্রামেগঞ্জে মাশরুমের জনপ্রিয়তা ও শিশুদের শরীরে পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুইই একসঙ্গে বাড়বে। মাশরুমের যোগান লাগে শহরেও, সেক্ষেত্রে সামান্য হলেও দুটো নগদ পয়সার মুখ দেখতে পাবে মায়েরা। এখন সরকারি ও প্রশাসনিক তৎপরতায় এই সাধু প্রচেষ্টাকে রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার বাসনা রয়েছে সৈকতের। তার জন্য তাঁকে যতটা পথ হাঁটতে হোক না কেন, সৈকত রাজি। ওঁকে যে কোনও রকম সহযোগিতা বা পরামর্শ দিতে চাইলে মেইল করুন saikatsarkardin@gmail.com।

নিজস্ব প্রতিনিধি

পাঁচকাহন : উত্তরে চলচ্চিত্র নির্মাণের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে রাখে

গত ৫ অগাস্ট কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে দেখানো হল পাঁচটি অণুগল্প নিয়ে তৈরি একলব্য প্রোডাকশনের সিনেমা সিরিজের প্রিমিয়ার শো। এটি এই প্রোডাকশন ইউনিটের দ্বিতীয় প্রয়াস।

পাঁচটি অণু-সিনেমা 'পাঁচকাহন'-এর মুক্তি উপলক্ষে দর্শকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করলেন নর্থ বেঙ্গল ফিল্ম টেলিভিশন আর্টিস্ট অ্যান্ড টেকনিশিয়ান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক

সঞ্জয় বর্মন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল শিল্পী অনন্য দে-র সেতারবাদন। প্রথম কাহন সম্রাট দত্তর 'কি— দি আলটিমেট লক'। এরপর একে একে দীপালোক ভট্টাচার্যর 'মাইন্ডস্কেপ', শুভম ভৌমিকের 'শেষ বিদায়', অনির্বাণ ঘোষের 'ঘুড়ি ও ডায়েরি' দেখানো হয়। প্রিমিয়ার শো উপলক্ষে এ দিন রবীন্দ্রভবন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। সিনেমাগুলোতে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁদের প্রায় বেশির ভাগই পেশাদার নন। কিন্তু প্রায় সকলেরই অভিনয় যথাযথ হয়েছে। এঁদের মধ্যে শিশুশিল্পীদের অভিনয়ও যথেষ্ট সাবলীল। আবহসংগীত অনেক ক্ষেত্রে আরোপিত মনে হয়েছে। তা সত্ত্বেও ডুয়ার্সে সিনেমা তৈরি করার কোনওরকম পরিকাঠামো ছাড়াই একলব্য প্রোডাকশন যে এ ধরনের শর্ট ফিল্ম নিয়ে কাজ করে চলেছে, তাদের সেই প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

নাট্য কর্মশালা উৎসাহী তরুণদের উত্তরণের পথ দেখাল

মাসখানেক হয়ে গেল রাজ্য জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির পর্ব শেষ হয়েছে। কোচবিহারে ৭-১৩ জুলাই সাত দিনের এই শিবিরে যোগ দিয়েছিল ২৫ জন থিয়েটারপ্রেমী ছেলেমেয়ে। কোচবিহার রবীন্দ্রভবন মঞ্চে 'থিয়েটার ইন জেনারেল'— এই বিষয়ের উপর আয়োজিত আবাসিক এই শিবিরের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। নয়জন প্রশিক্ষক তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্র অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সেই বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেন। শরীর ও অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা করেন অর্ণ মুখোপাধ্যায়, কণ্ঠ ও অভিনয়— অদ্রিজা দাস, মন ও অভিনয়— শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, থিয়েটার ও তার বৈচিত্র এবং থিয়েটার ও সমাজ— দেবাশিস মজুমদার, মঞ্চসজ্জা— সন্দীপ ভট্টাচার্য, রূপসজ্জা— সঞ্জয় পাল, আলো— সুদীপ সান্যাল। শিবিরের শেষ দিন অভিনীত হয় শিক্ষার্থীদের দ্বারা আয়োজিত নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বীরপুরুষ'। অনুষ্ঠানের শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

নাটকের টানে শিবিরে এলেও এই সাত দিনে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা ২৫ জন ছেলেমেয়ে যেন পরস্পরের আত্মীয় হয়ে উঠেছে বলে জানাল শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেবাশিস বিশ্বাস, সৌরভ গোপরা। এই ক'দিন তাদের কেটেছে কঠোর অনুশাসনে। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলেছে তাদের যোগাভ্যাস থেকে শুরু করে ওঠা, বসা, খাওয়া, ঘুমানো— সবকিছু। আরেক শিক্ষার্থী এমিলি দাসের মতে, এই সাত দিন তারা নাটক নিয়ে কাটালেও, একটি নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির যে মানুষের মনকে এতটা পালটে দিতে পারে, তা এই শিবিরে যোগ না দিলে জানা যেত না। দীর্ঘ এক দশক পরে হওয়া এই নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির তাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

লোক সংগীতের ডালি নিয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে ডুয়ার্সের ব্যান্ড

ঋ

একটা সময় বাংলা গান থেকে যখন বাঙালি শ্রোতা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল, ঠিক সে সময় বাংলায় এক নতুন বাংলা গানের দল আত্মপ্রকাশ করে। দলটির নাম ছিল 'মহিনের ঘোড়াগুলি'। এই দলটির হাত ধরেই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বাংলা গানের ব্যান্ডের আগমন। তখন বাঙালি দেখল বিদেশে ব্যান্ড মিউজিকের কালচার এই বাংলার মাটিতেও আছড়ে পড়তে পারে। মহিনের ঘোড়াগুলির একের পর এক গান বাঙালি সংগীতপ্রেমীদের মন কাড়তে শুরু করে। আর এরপর থেকেই কলকাতায় একের পর এক নিত্যনতুন বাংলা ব্যান্ডের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে। বাঙালি শ্রোতা, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায় বাংলা ব্যান্ডের গানে ক্রমেই আসক্ত হয়ে পড়ে।

এরপর বাংলা ব্যান্ডের বাজার আর শুধু কলকাতায় সীমাবদ্ধ থাকল না। জেলায় জেলায় গান পাগল তরুণদের জোটবদ্ধ বাংলা ব্যান্ডের সূচনা হতে শুরু করে। তারাও যথেষ্ট দর্শক শ্রোতাদের বাংলা গানের প্রতি আকৃষ্টি করতে সহায়ক ভূমিকা নেয়। উত্তরবঙ্গের দুই প্রধান শহর শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির পাঁচ তরুণ উদ্যোগী হয়ে গত বছর ২০ মে নতুন একটি বাংলা গানের দল গড়ে তোলে। নাম রাখে 'ঋ'। বাংলা বর্ণমালার 'ঋ'-এর আভিধানিক অর্থ 'সততার প্রতীক'। দলের এই পাঁচ তরুণ সদস্য মনে করে, তারা সততার সঙ্গে বাংলা গানকে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতে চায়। আর তাই তাদের ব্যান্ডের নাম 'ঋ'। এই 'ঋ' নাম দানের পেছনে শিলিগুড়ির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের বাংলা শিক্ষিকা মধুমিতা চৌধুরীর অবদানকে স্বীকার করে ব্যান্ডের সদস্যরা। গানের এই দলটি মূলত লোক সংগীতের দল হিসেবেই পরিচিতি পেতে আগ্রহী।

> বাংলা বর্ণমালার 'ঋ'-এর আভিধানিক অর্থ 'সততার প্রতীক'। দলের এই পাঁচ তরুণ সদস্য মনে করে, তারা সততার সঙ্গে বাংলা গানকে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতে চায়। আর তাই তাদের ব্যান্ডের নাম 'ঋ'।

'ঋ' ব্যান্ডের সদস্যরা হলেন গায়ক সুজিত মুখার্জি, লিড গিটারে তাপস পাল, বেস গিটারে বিশ্বজিৎ কর, ড্রামসে সৌরভ রায় এবং কাহন ও বেস গিটারে কৌশিক কুন্ডু। ২০১৬ সালের ২২ মে এরা প্রথম তাদের অনুষ্ঠান করে শিলিগুড়ির সুমিতা ক্যান্সার সোসাইটির অনুষ্ঠানে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ছিল চম্পাসারীতে। এরপর শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি-রায়গঞ্জ বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন মঞ্চে লোকগীতির ডালি তুলে ধরেছে একের পর এক

অনুষ্ঠানে। গত পুজোতে টানা সিডিউল ছিল তাদের। কিন্তু পুজোর মরশুম শেষ হতেই দলের লিড গিটারিস্ট তাপস পাল হৃদরোগ জনিত অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়ায় দলের অনুশীলনে ভাঁটা পরে। প্রায় আড়াই মাস কোনও অনুষ্ঠান করতে পারেনি এই দল। অবশেষে গত রং খেলার সময় থেকে আবার নতুনভাবে মাঠে নেমে পড়ে ঋ ব্যান্ড।

তাপস পালের চম্পাসারীর বাড়িতে বসেই নিয়মিত শুরু হয় সংগীত চর্চা। আবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে থাকে দলের গান পাগল সদস্যরা। এফ এম রেডিও'তে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের আরও কাছে যায় তারা। জলপাইগুড়িতে 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার দপ্তর আড্ডাঘরেও অনুষ্ঠান পরিবেশন করে নজর কেড়েছে শ্রোতাদের। অনুষ্ঠান করার সুবাদে দক্ষিণবঙ্গের শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগও দৃঢ় হচ্ছে তাদের। গত ২০ মে দলের প্রথম বর্ষপূর্তিতে শিলিগুড়ি ফ্লেম অফ হোপ নামে অনাথ ও প্রতিবন্ধী শিশুদের এক মিশনারিজ আশ্রমে গানবাজনার মধ্য দিয়ে আনন্দের সঙ্গে দিনটি পালন করেছে 'ঋ' ব্যান্ডের সদস্যরা। দলের গিটারিস্ট কৌশিক কুন্ডু বলেন, টাকা আয়ের জন্য নয়, বাংলা লোকগানকে বাঙালি তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে আরও জনপ্রিয় করতেই মূলত উদ্যোগী তারা।

শুভ্রজিৎ পোদ্দার

'ঋ' ব্যান্ডের সদস্যরা হলেন গায়ক সুজিত মুখার্জি, লিড গিটারে তাপস পাল, বেস গিটারে বিশ্বজিৎ কর, ড্রামসে সৌরভ রায় এবং কাহন ও বেস গিটারে কৌশিক কুন্ডু।

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-১৬। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-10 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.